ষ্ক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
(কলিকাতা গেজেট—৩১শে মার্চ্চ ১৯৪১)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আশ্বিন
১৩৫১

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

দেব-সাহিত্য-কুটীর

২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দাম—এক টাকা

প্রিণ্টার—এস, মজুমদার

দেব-প্রেস

২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

বেতার-সাহিত্যশিল্পী সুরসিক-সুহৃদ

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

করকমলেষু

বক্তব্য

"আধুনিক রবিনহুড্" গল্পের বই ; কিন্তু এর প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই গোয়েন্দা ও অপরাধীদের নিয়ে রচিত কাহিনীগুলির কোনটিই কাল্পনিক নয়। সত্য-সত্যই যা ঘটেছে এর মধ্যে স্থান হয়েছে তারই। গল্পগুলি পড়বার সময়ে সেই কথাই মনে রাখতে হবে। কেবলমাত্র "অবশিষ্টে" দেখানো হয়েছে, গোয়েন্দাদের কীর্ত্তি সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন ও আধুনিক কাল্পনিক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে কেমন ক'রে।

মানুষের সভ্যতায় অপরাধী ও গোয়েন্দা, এই দুইয়েরই জীবন হচ্ছে অত্যন্ত বিচিত্র এবং সেই জন্যেই ধর্ম্মমূলক সাহিত্যেও অর্থাৎ বাইবেল, রামায়ণ ও মহাভারতেও তাদের পরিহার করা সম্ভবপর হয় নি। রাবণ ও দুর্য্যোধনের মত অপরাধী না থাকলে রামায়ণ ও মহাভারতের মূল্য কমে যেত কতখানি, চিন্তাশীলরা তা ভেবে দেখতে পারেন। এবং গোয়েন্দাকাহিনীর বিশেষত্বও ঐ দুখানি কথা-কাব্যের মধ্যে নানা স্থলেই আবিষ্কার করা যায়। একটি ছোট দৃষ্টান্ত দি। রাবণ যখন সীতা হরণ ক'রে পুষ্পক-রথে চ'ড়ে লঙ্কায় যাত্রা করেন, সীতা তখন গায়ের গহনাগুলি খুলে একে একে পথে পথে ফেলে দিতে দিতে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, এই সূত্র ধ'রেই রামচন্দ্র তাঁর অনুসরণ করতে পারবেন। এই যে সূত্র, এ হচ্ছে গোয়েন্দা-কাহিনীরই সূত্র!……বাইবেলের গোয়েন্দাকাহিনী আমাদের "অবশিষ্টে"র মধ্যেই পাওয়া যাবে।

আদিম যুগে অপরাধ স্থষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই যে গোয়েন্দার আবির্ভাব হয়, এটুকু অনুমান করা যায় অনায়াসেই,—যদিও তখনো পেশাদার গোয়েন্দার জন্ম হয় নি। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা তুচ্ছ সূত্র ধ'রে গভীর বন-জঙ্গলের মধ্যে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ পার হয়ে এমন ভাবে পলাতক অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে পারে, যা দেখলে ডিটেকটিভ উপন্যাসের বিখ্যাত সার্লক্ হোম্‌সের বাহাদুরিও খুব-বেশী উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে হবে না!

কেবল মানুষ কেন, সময়ে সময়ে নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুরাও প্রকাশ করে গোয়েন্দার বিশেষত্ব! বনের মধ্যে বাঘিনীর অজ্ঞাতসারে তার বাচ্চা চুরি ক'রে কেউ যদি বহুদূরে পালিয়ে আসে, তাহ'লে প্রায়ই দেখা গিয়েছে, বাঘিনী ঠিক খুঁজে খুঁজে যথাস্থানে এসে নিজের বাচ্চাকে আবিষ্কার না ক'রে ছাড়ে নি! কুকুর লেলিয়ে শৃগাল শিকার করা হচ্চে, বিলাতের একটি সখের খেলা বা 'স্পোর্ট'! অনুসরণকারী মানুষ ও কুকুরদের বিপথে চালনা করবার জন্যে সে সময়ে পলাতক শৃগালরা এমন সব অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে যা অত্যন্ত বিস্ময়কর। ধরুন, শৃগাল হয়তো একটা নদীর ধারে এসে পড়ল। কিন্তু প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে সে সোজাসুজি নদী পার হয় না। কারণ সে জানে, মানুষ চালিত কুকুররা সহজ বুদ্ধিতে সরাসরি নদীর ওপারে গিয়ে আবার তার 'গন্ধ' খুঁজে পাবে। অতএব শৃগাল নদীর জলে প'ড়ে আগে ডাইনে বা বাঁয়ে সাঁৎরে অনেক দূর চ'লে যায় এবং তারপর নদী পার হয়! এই যে যুক্তিসিদ্ধ বুদ্ধি, মানুষ গোয়েন্দা বা অপরাধীর বুদ্ধির চেয়ে এর মূল্য কিছুমাত্র কম নয়!

অপরাধী ও গোয়েন্দার কার্য্যকলাপ সাধারণ মানুষের কাছে যার-

পর-নাই চিত্তাকর্ষক এবং সেইজন্যে তাদের নিয়ে সারা পৃথিবীতে এক বিরাট, কাল্পনিক ও জনপ্রিয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। মনগড়া গল্পই যখন লোকের এত ভালো লাগে, তখন এ-সম্বন্ধে সত্যকাহিনী বাঙালী পড়ুয়াদের মনোরঞ্জন করতে পারবে অধিকতর, এই বিশ্বাসেই "আধুনিক রবিন্‌হুড্" প্রকাশ করা হ'ল। ইতি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পরিচয়

পরিচয়

তোমাদের কাছে প্রায়ই আমি ভূতের গল্প বা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী ব'লে থাকি। কিন্তু আজ আমি তোমাদের কাছে একটি ডিটেক্‌টিভের গল্প বলব।

এটি তোমরা বাজে গাল-গল্প ব'লে মনে কোরো না। য়ুরোপের অষ্ট্রিয়া দেশে এই সত্য ঘটনাটি ঘটেছিল। আমরা ঘটনাটি উদ্ধার করব পুলিসের নিজের ডায়েরি থেকেই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুলিসের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার পুলিসের মস্ত একটি তফাৎ আছে, সেটিও তোমাদের জানিয়ে রাখি। অন্য অন্য দেশের পুলিস চুরি-ডাকাতি-খুনের কিনারা করবার জন্যে বাইরের কারুর দরজায় গিয়ে ধর্ণা দেয় না। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার পুলিস যখন কোন গোল্‌মেলে মামলায় পড়ে, তখন প্রায়ই সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সাহায্য নিয়ে থাকে।

প্রফেসররা পুলিসকে সাহায্য করেন শুনে তোমরা বোধ হয় অবাক হচ্ছ? কিন্তু এতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ অষ্ট্রিয়ার ইউনিভার্সিটিতে অপরাধতত্ত্বের একটি বিভাগ আছে। ঐ প্রফেসররা সেই বিভাগেই ছাত্রদের শিক্ষা দেন। ওখানকার এক একজন প্রফেসর অপরাধ-তত্ত্বে এত-বেশী পণ্ডিত যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভরাও তাঁদের কাছে হার মানতে বাধ্য। নীচের ঘটনাটি শুনলেই তোমরা প্রফেসরদের বাহাদুরির কিছু-কিছু প্রমাণ লাভ করবে।

বিখ্যাত ভিয়েনা সহর যে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী, এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। ঐ ভিয়েনা সহরের পুলিসের বড়-সাহেবের কাছে একদিন ডাকযোগে একটি পার্সেল এল।

পার্সেলের মোড়ক খুলেই বড়-সাহেবের চক্ষু স্থির আর কি! মোড়কটি পুরানো খবরের কাগজের। তার ভিতরে একটি চলতি সিগারেটের প্যাকেট, এবং প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে মানুষের বাঁ-হাত থেকে কেটে নেওয়া একটি তর্জ্জনী! দেখলেই বোঝা যায়, আঙুলটা কাটা হয়েছে মেয়ে মানুষের হাত থেকে!

পাঁচদিন পরে আবার এক পার্সেল এসে হাজির। তার মধ্যে রয়েছে স্ত্রীলোকের ডান হাত থেকে কেটে নেওয়া একটি মধ্যমাঙুলি! আঙুলে আবার একটি বিয়ের আংটি!

বড়-সাহেব তো হতভম্ব! একী ভয়ানক কাণ্ড! পুলিসের বড়-সাহেব হয়ে জীবনে তিনি অনেক ভীষণ ব্যাপার দেখেছেন, কিন্তু এমন ভয়াবহ ব্যাপার তাঁর কল্পনারও অতীত! সাধারণ হত্যাকারী

চুপি চুপি খুন ক'রে মানে মানে কোনরকমে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচে, কিন্তু এই পার্সেল দুটো যে পাঠিয়েছে সে এতবড় অসমসাহসী যে, নিজের পৈশাচিক কাণ্ডের নমুনা বার বার পুলিসের বড়-সাহেবের গোচরে আনতেও সঙ্কুচিত নয়!

সাধারণ খবরের কাগজের মোড়ক, সাধারণ সিগারেটের প্যাকেট এবং পার্সেলের উপরের ঠিকানাও লেখা একটি নূতন টাইপরাইটারের সাহায্যে। ডাকঘরের ছাপও ভিয়েনা সহরের।

ভিয়েনা সহরে কলকাতার চেয়েও বেশী লোক বাস করে, তার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আঠারো লক্ষ। এত-বড় সহরের লক্ষ লক্ষ বাসিন্দার ভিতর থেকে কোন্ সয়তান যে পুলিসের বড়-সাহেবের সঙ্গে এই বীভৎস কৌতুক করছে, তা অনুমান করবার কোন সূত্রই পার্সেলের ভিতর থেকে পাওয়া যায় না। অথচ এই পাপিষ্ঠকে তাড়াতাড়ি ধরতে না পারলে পুলিসের নিন্দার আর সীমা থাকবে না।

আর কোন উপায় না দেখে বড়-সাহেব তখনি ইউনিভার্সিটির একজন পরিচিত প্রফেসরের কাছে ছুটে গেলেন।

প্রফেসর তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব'সে সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, "আঙুল দুটো দেখি!"

বড়-সাহেব মোড়ক, সিগারেটের প্যাকেট, কাটা আঙুল দুটো ও আংটি বার ক'রে টেবিলের উপরে রাখলেন।

খানিকক্ষণ মন দিয়ে পরীক্ষা করবার পর প্রফেসর বললেন, "হুঁ আঙুলের অবস্থা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, তর্জ্জনীর পর যখন মধ্যমাঙ্গুলি কেটে নেওয়া হয়, হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি তখনো জ্যান্তো।

ছিল। মড়ার দেহ থেকে কাটা আঙুল এ রকম হয় না। হয়তো এখনো সে জ্যান্তো আছে। একটি জীবন্ত মেয়ের দুই হাত থেকে

দুটো আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে, তাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে খুন করা হচ্ছে!"

বড়-সাহেব শিউরে উঠে বললেন, "ভয়ানক প্রফেসর! ভয়ানক! আপনি তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করুন, হয়তো অভাগিনীকে এখনো আমরা বাঁচাতে পারি!"

প্রফেসর আঙুলের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ ক'রে বললেন, "আঙুল দুটি দেখে বলা যায়, এ কোন সাধারণ ছোটলোকের মেয়ের আঙুল নয়। তারপর আঙুলদুটো যে রকম সূক্ষ্মভাবে কাটা হয়েছে, তা দেখে মনে হয়,—"

বড়-সাহেব সাগ্রহে বললেন, "কি মনে হয় প্রফেসর, কি মনে হয়?"

"মনে হয়, শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হত্যাকারী খুব অভ্যস্ত, আর ব্যবচ্ছেদ করবার অস্ত্রশস্ত্র তার কাছেই আছে! বড়-সাহেব, আমার বিশ্বাস, হত্যাকারী হয় সাধারণ ডাক্তার, নয় অস্ত্র-চিকিৎসক, নয় সে শব-ব্যবচ্ছেদাগারে কাজ করে, কারণ অব্যবসায়ী লোক এমন কৌশলে আঙুল কাটতে পারে না!"

বড়-সাহেব এতক্ষণ পরে একটা বড়-সূত্র পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

প্রফেসর বললেন, "এভাবে যন্ত্রণা দিয়ে যে নরহত্যা করে, সে নিশ্চয়ই নিষ্ঠুরতার ভক্ত। আংটিতে ঐ সুতোটা বাঁধা কেন?"

বড়-সাহেব হাস্য ক'রে বললেন, "প্রফেসর, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে ও-সুতোটা অত মন দিয়ে দেখবার দরকার নেই। হাত দিয়ে না ছুঁয়ে আংটিটা তুলবো বলে আমিই ঐ সুতো বেঁধেছি।"

প্রফেসর অতসী-কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙিন সুতোটা দেখছে,

দেখতে বললেন, "সূতো আপনি বাঁধতে পারেন, কিন্তু সূতোর যে-অংশ আংটির গায়ে বাঁধা ছিল, সেখানটা এমন বেরঙা হয়ে গেছে কেন? আচ্ছা, দেখা যাক্!"

খানিকক্ষণ সূতোটা নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করে প্রফেসর বললেন, "সূতোর ভিতরে indigotin disulphonic অ্যাসিড রয়েছে।"

বড়-সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, "ও অ্যাসিড তো আমার ছিল না! কি কি কাজে ঐ অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়।"

প্রফেসর বললেন, "উপস্থিত ক্ষেত্রে হয়তো উল্কি তোলবার জন্যই ঐ অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছে। হুঁ, যা ভেবেছি তাই! এই দেখুন, কাটা মধ্যমাঙ্গুলির উপর থেকে উল্কি তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে! কিন্তু অ্যাসিডে চামড়া ক্ষয়ে গেলেও দাগ দেখে বোঝা যায়, আঙুলে উল্কিতে আঁকা ছিল একটা ছোট্ট সাপ!"

বড়-সাহেব বললেন, "ছোট্ট সাপ!"

—"হ্যাঁ বড়-সাহেব! হত্যাকারী বোধ হয় কোন স্ত্রীলোকের হাতে জোর ক'রে একটা সাপ এঁকে দিয়েছিল! সে বোধহয় বলতে চেয়েছিল—'তুমি কালসাপিনীর মত দুষ্ট, তাই তোমার আঙুলে এই ছাপ দেগে দিলুম!" কিন্তু তারপরও স্ত্রীলোকটি বোধ হয় তাকে পুলিসের ভয় দেখায়। হত্যাকারী তখন হয়তো বলে,—'তুমি আমাকে পুলিসের ভয় দেখাচ্ছ? বেশ, তাহলে পুলিসের কাছে যে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দেবে, তোমার সেই আঙুলই কেটে নিয়ে পুলিসের কাছে আমি উপহার পাঠাব!' কিন্তু আঙুলটা পাঠাবার

সময়ে সাবধানী হত্যাকারী উল্কিটা তুলে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।"

বড়-সাহেব বললেন, "প্রফেসর, এইবারে আপনি কবির মত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন! এ-সব স্বাভাবিক কথা নয়!"

প্রফেসর হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমার এ অনুমান মিথ্যা হ'তেও পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা কোন স্বাভাবিক হত্যাকারীর কীর্ত্তি নিয়ে আলোচনা করছি না; কিন্তু সে কথা এখন থাক্, আপনাকে আসল পথতো আমি দেখিয়ে দিয়েছি আপনি অস্ত্র-চিকিৎসকদের মধ্যেই হয়তো হত্যাকারীর সন্ধান পাবেন।"

পুলিসের বড়-সাহেবের হুকুমে তখনি দলে দলে ডিটেক্‌টিভ ও গুপ্তচর ভিয়েনার বিভিন্ন শব-ব্যবচ্ছেদাগারে ও অস্ত্র-চিকিৎসকদের বাড়ীর দিকে ছুটল এবং প্রত্যেক ডাক্তারের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হ'ল। ভিয়েনার বিরাট জন সমুদ্রের মধ্যে পুলিস এতক্ষণ পরে একটা যেন দ্বীপের মত ঠাঁই খুঁজে পেলে, গোয়েন্দাদের আর দিশে-হারার মত হাবুডুবু খেতে হ'ল না। এই খোঁজা খুঁজির ফলে কয়েক-জন অসাধু ডাক্তার ধরা পড়ল বটে, কিন্তু আসল অপরাধী তখনো নিরুদ্দেশ হয়েই রইল।

তারপর একদিন একটি যুবক অস্ত্র-চিকিৎসক পুলিসের বড়-সাহেবের কাছে এসে যা বললে তা হচ্ছে এই:

আসল অপরাধী কে তা আমি জানিনা বটে, কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হয়েছে।

কিছুদিন আগে আমাদের হাসপাতালে আনা উইস্ নামে একটি

মেয়ে-ডাক্তার কাজ করতে আসে। আনা যত রোগী দেখত, তাদের সকলকেই বলত, ডাঃ স্মিট্‌জ্-এর কাছে গিয়ে অস্ত্র-চিকিৎসা করতে। অথচ ডাঃ স্মিট্‌জ্ আমাদের হাসপাতালের দলভুক্ত নন। পরে জানা যায়, ডাঃ স্মিট্‌জের সঙ্গে আনার বিয়ের কথা চল্‌ছে।

তারপর ডাক্তার মহলে কাণাঘুষায় শোনা গেল, ডাঃ স্মিট্‌জ্ নাকি একই রোগীর উপরে অকারণে বার বার অস্ত্রপ্রয়োগ ক'রে ডবল ডে-ডবল ফি আদায় করেন। যেন তিনি খুব সহজেই তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে উঠতে চান।

কিছুদিন পরে শুনলুম, আনার সঙ্গে ডাঃ স্মিট্‌জের বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে গেছে, তিনি বার্থা নামে আর একটি মেয়ে-ডাক্তারকে বিয়ে করতে চান।

দিন কয়েক হ'ল, আনা আমাদের হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। ডাঃ স্মিট্‌জ্ও এখন সহরের বাইরে গিয়েছেন আর বার্থারও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

গোয়েন্দারা এইবারে ডাঃ স্মিট্‌জের সন্ধান করতে লাগল।

স্মিট্‌জের এক পরিচিত রোগী খবর দিলে, সে ডাক্তারকে সামার্লিং-এর ট্রেণ ধরতে দেখেছে। সামার্লিং হচ্ছে অষ্ট্রিয়ারই একটি পাহাড়ে-জায়গা, লোকে সেখানে হাওয়া বদলাতে যায়।

পাহাড়ের কোন নির্জ্জন স্থানে একটি বাড়ী। গোয়েন্দারা সেইখানেই ডাঃ স্মিট্‌জ্‌কে আবিষ্কার করলে।

তখন অনেক রাত হয়েছে, স্তব্ধতা ভেদ ক'রে সশব্দে বইছে

কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস। অন্ধকার আকাশে একটা তারা পর্য্যন্ত উঁকি মারছে না। গোয়েন্দারা চুপি চুপি বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই সভয়ে শুন্‌তে পেলে, মৌন রাত্রি হঠাৎ কেঁপে উঠল স্ত্রী-কণ্ঠের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে! কে যেন বিষম যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেই আবার থেমে পড়ল!

আধ অন্ধকারে একটা প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া মূর্ত্তি আস্তে আস্তে সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল—তার পিছনে পিছনে একটি স্ত্রীলোক।

একজন ডিটেক্‌টিভ্ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, "ডাক্তার, তুমি আমাদের বন্দী!"

ডাক্তার এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে বাড়ীর দরজা আবার বন্ধ করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার আগেই গোয়েন্দারা তাকে চারিদিক্ থেকে ঘিরে ফেললে। তখন আরম্ভ হল বিষম এক ধস্তাধস্তি। কিন্তু সেই বিপুলবপু মহা-বলিষ্ঠ ডাক্তারকে কাবু করা সহজ নয় দেখে, একজন গোয়েন্দা রিভলভারের বাঁট দিয়ে এত জোরে তার মাথায় আঘাত করলে যে, সে তখনি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল। তার সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটিও ধরা পড়ল। সে হচ্ছে বার্থা, ডাক্তারের নতুন বউ।

বাড়ীর ভিতরের একটা ঘরে, অস্ত্রোপচারের টেবিলের উপরে পাওয়া গেল হতভাগিনী আনাকে অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায়। তার দুই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ইথারের গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ।

কয়েক ঘণ্টা পরে আনা বললে, "হ্যাঁ, ডাঃ স্মিট্‌জ্ আমাকে বিয়ে করবেন বলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে অস্ত্র-চিকিৎসা করবার জন্যে

রোগীদের পরামর্শ দিতুম। একই রোগীর দেহে অকারণে বার বার অস্ত্র চালিয়ে ডাক্তার অন্যায়রূপে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন।

তারপর ডাক্তার আমাকে ছেড়ে বার্থাকে বিয়ে করতে চান। সেইজন্যে আমি রাগ ক'রে বলি তাঁর অন্যায় চিকিৎসার কথা পুলিসের কাছে প্রকাশ ক'রে দেব। ডাক্তারও তখন ক্ষাপ্পা হয়ে একদিন আমাকে ধ'রে জোর ক'রে আমার হাতে উল্কির এক সাপ এঁকে দেন।

তারপরেও আমি পুলিসে খবর দিতে চাই শুনে, তিনি আমার কাছে মাপ চেয়ে অনুতপ্ত ভাবে বললেন, "আচ্ছা আমি তোমাকেই বিয়ে করব। কিন্তু বিয়ের আগে আমি হপ্তাখানেকের জন্যে সামার্লিংএ হাওয়া বদ্লাতে যেতে চাই, তুমিও আমার সঙ্গে চল।"

আমি খুব খুসি হয়ে বোকার মত ডাক্তারের সঙ্গে এখানে চলে আসি। তারপর আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে। ডাক্তার আর বার্থা দুজনে মিলে আমার দু-হাতের দুটো আঙুল কেটে নিয়েছে। আঙুল কেটে নিয়ে ডাক্তার আমাকে বলেছে, "কাল সাপিনী। তোমার আঙুলে কাল-সাপ এঁকে দিয়েছি, তবু তোমার চৈতন্য হয়নি। আচ্ছা, ধীরে ধীরে সমস্ত হাত কেটে নিয়ে আমি তোমার বন্ধু পুলিসকেই উপহার দেব।"

আপনারা না এলে এই দানব আর দানবী আমার দেহকে খণ্ড খণ্ড ক'রে আমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করত।"

ডাঃ স্মিট্জের আর বিচার হল না, কারণ গোয়েন্দার রিভলভারের

চোটে তার খুলি কেটে গিয়েছিল এবং তা'তেই তার মৃত্যু হয়। বার্থা গেল জেলখানায়।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের বাহাদুরিটা দেখলে তো? যেন মন্ত্রশক্তি বলেই শূন্যতার ভিতর থেকে সূত্র আবিষ্কার ক'রে অনুমানে তিনি যা যা বলেছিলেন, তার একটা কথাও মিথ্যা হ'ল না এবং তিনি না থাকলে পুলিস এ মামলার কোনই কিনারা করতে পারত না।

পারিসের পুলিস-দপ্তরে একটি আশ্চর্য্য ছোক্‌রার জীবন চরিত লিপি-বদ্ধ আছে, সেইটিই তোমাদের শোনাব। মনে রেখ, এই অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীর একটি বর্ণও আমার বানানো নয়।

নাম তার আবাদি। সে নিশ্চয় কোন হাড়-গরিব হাঘরে বাপ-মায়ের ছেলে। যখন তার বয়স মোটে একদিন, সেই

সময়েই তার বাপ-মা তাকে পারিসের রাজপথে ফেলে পালিয়ে যায়।

আবাদি রাস্তায় পড়ে বেড়াল-কুকুরের বাচ্চার মত কাঁদতে লাগল। এক বুড়ী ন্যাকড়া-কুড়ুনী সেখান দিয়ে যেতে যেতে তার কান্না শুনতে পেলে। সে খালি ন্যাকড়া কুড়ত না, পথে পথে ভিক্ষাও করত। বুড়ী বুঝলে, এই খোকাটাকে দেখিয়ে সে খুব সহজেই লোকের মন ভেজাতে পারবে। সে তখনি আবাদিকে কোলে ক'রে নিয়ে গেল।

বুড়ী যা ভেবেছিল, তাই। তার কোলে ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো, অতটুকু একটী কচি খোকাকে দেখে সকলেরই মনে দয়ামায়ার সঞ্চার হয়। প্রত্যেকেই বুড়ীর হাতে কিছু-না-কিছু গুঁজে দেয়। এইভাবে তার রোজগার খুব বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন উঁচু জায়গা থেকে পাথরের [illegible]র উপরে প'ড়ে গিয়ে আবাদির শিরদাঁড়া গেল দুমড়ে বেঁকে। বয়সে কচি ব'লে সে প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু তাকে দেখতে হ'ল বিকলাঙ্গ কুঁজোর মত।

এদিকে বুড়ীর রোজগার দেখে পারিসের অন্যান্য ভিখারীর চোখ টাটিয়ে উঠল। তারা বুঝলে, বুড়ীর শ্রীবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে ঐ আবাদি।

অন্য এক ভিখারী একদিন বুড়ীকে খুন ক'রে আবাদিকে চুরি করে নিয়ে গেল। সেখান থেকে সে কিছুদিন পরে আবার হাত-

ফের্ত্তা হ'ল। বছর-ছয়েক বয়সের মধ্যে আবাদি এই ভাবে নানা ভিখারীর ঘরে আশ্রয় লাভ করলে।

নানা চরিত্রের ভিখারীর সঙ্গে থেকে ছয় বছর বয়সেই আবাদি হয়ে উঠল খুব চালাক-চতুর। সে জাল-অন্ধ ও নকল-খোঁড়া সেজে কেবল ভিক্ষা করতেই শিখ্‌লে না, চুরি-বিদ্যাতেও তার হাতে-খড়ি হ'ল। ক্ষুদে দেহ নিয়ে যে-কোন গর্ত্ত দিয়ে গ'লে সে লোকের বাড়ীর ভিতরে ঢুকত, তারপর যা পেত তাই নিয়েই বাইরে পালিয়ে আসত। পথে কোন অন্ধ বা পঙ্গু ভিখারী ব'সে আছে, হঠাৎ আবাদি এসে তার ভিক্ষা-করা টাকা পয়সা তুলে নিয়ে দিলে দে-ছুট্!

আবাদির মতন ছেলে যে চুরি-জুয়াচুরি শিখবে, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা নয়, সে মানুষ হয়েছে চোরজুয়াচোরের ঘরেই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, লেখাপড়ার দিকে ছিল তার অত্যন্ত প্রাণের টান। কোন মাষ্টার সে পায় নি, কেউ তাকে পড়াশুনো করতে বলে নি, কিন্তু তবু কি বিচিত্র উপায়ে সে লিখতে-পড়তে শিখেছিল তা জানো?

তার ভিখারী-মনিবরা প্রতিদিন যখন এক দুই তিন ক'রে পয়সা গুণত ও হিসাব করত, আবাদি তখন মন দিয়ে শুনত। এই উপায়ে সে ছোটখাটো অঙ্ক শিখে নিলে। পারিসের রাজপথে বিজ্ঞাপনের 'পোষ্টার' ও বিভিন্ন রাস্তার নাম দেখে দেখে তার বর্ণপরিচয় হয়ে গেল। পড়তে শিখলে বটে, তাকে বই কিনে দেবার লোক নেই। কিন্তু আঁস্তাকুড় খুঁজে সে গৃহস্থদের ফেলে দেওয়া ছেঁড়া বই ও পুরানো

খবরের কাগজ কুড়িয়ে আনত এবং তার দ্বারাই পুস্তকের অভাব দূর করত!

আরো একটু বড় হয়ে আবাদি পথের ধারের 'বুক-ষ্টল' থেকে দোকানীর অগোচরে বই চুরি করতে লাগল। পথে-ঘাটে বা পার্কে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ছবির ও গল্পের বই নিয়ে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ কোথা হতে আবাদি এসে চিলের মত ছোঁ মেরে বই কেড়ে নিয়ে আবার কোথায় চম্পট দিলে! পারিসের বড় বড় বাড়ীর নীচে মাটির তলায় কুঠুরী থাকে। এমন একটি কুঠুরী ছিল আবাদির আড্ডা। সেখানে সে রীতিমত একটা লাইব্রেরি বানিয়ে ফেললে।

তার মতন বুদ্ধিমান ছেলে যদি সৎপথে থাকত, তা'হলে আজ হয়তো পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় ও শ্রদ্ধা-সম্মানের অধিকারী হতে পারত। কিন্তু অসত্য পথে গিয়ে সে প্রকৃত মানুষ হবার সব সুযোগেই বঞ্চিত হয়েছে। পুলিস-দপ্তরের বাইরে কোথাও তার ঠাঁই নেই।

... ...

আবাদির বয়স যখন এগারো বছর, তখন সে স্বাধীন, কোন ভিখারীর তাঁবে আর কাজ করে না। জোর ক'রে বা ধমক দিয়ে তাকে তাঁবে রাখবার ক্ষমতাও কোন ভিখারীর ছিল না। প্রথম প্রথম সে অন্ধ বা পঙ্গু ভিখারীদের পুঁজিপাটা লুট ক'রেই অন্নের সংস্থান করত। তারপর অত অল্প লাভে তার মন আর খুসি হ'ত না। তেরো বছর বয়সে এক ধনীর বাড়ীতে হানা দিয়ে সে অনেক টাকা-কড়ি নিয়ে স'রে পড়ল। পুলিস এই ছোট্ট [illegible] চোরের বর্ণনা

পেলে, কিন্তু তার খোঁজ পেলে না। পনেরো বছর বয়সে আবাদি তার মতন আরো তিনজন ছোক্‌রা সহকারী পেলে, তারা তাকে 'সর্দ্দার' ব'লে ডাকতে স্বরু করলে। দু'বছরের মধ্যে তার দলে আরো তিন ছোক্‌রা যোগ দিলে। দল নিয়ে আবাদি-সর্দ্দার নিয়ম ক'রে চুরি-ব্যবসা চালাতে লাগল। একদিন তারা এক গুদামে চুরি করতে ঢুকেছে, এমন সময়ে পাহারাওয়ালার আবির্ভাব! কিন্তু আবাদি-সর্দ্দার ও তার দলবলের হাত থেকে বিষম উত্তম-মধ্যম লাভ করে পাহারা-ওয়ালা হ'ল কুপোকাৎ! সতেরো বছর বয়সে আবাদি প্রথম রক্তের স্বাদ পেলে। এক ডিটেক্‌টিভ তাকে গ্রেপ্তার করতে এল, কিন্তু আবাদি ছোরা মেরে তাকে বেহুঁস্ ক'রে ফেললে।

আবাদির দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিস-সহরে চুরি-রাহাজানি অসম্ভব বেড়ে উঠল। কারুর লোহার সিন্দুক ভাঙে, কারুর পকেট যায় কাটা, কারুর মাথায় পড়ে লাঠি। সহরে হৈ-চৈ উঠল।

আবাদির এই সময়কার একখানা ডায়ারি পাওয়া গিয়েছে। তাতে সে লিখেছে: "জীবন হচ্ছে যুদ্ধ। যে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তাকেই আমি মারব। মানুষের সমাজে দুটো দল দেখি। একদলের সব আছে, আর-একদলের কিছুই নেই। যাদের সব আছে, তাদের মাথা কেটে নিয়ে আমি আমার অভাব পূরণ করতে চাই। দুর্ব্বলকে ভক্ষণ করুক্ বলিষ্ঠরা এবং পুলিস গণনা করুক ক-জন মারা পড়ল।"

সত্যসত্যই পুলিসকে গণনা আরম্ভ করতে হ'ল। একের নম্বর হচ্ছে, কেচ্। কেচ্ ছিল আবাদি-সর্দ্দারের ডানহাত। সর্দ্দার কাণা-ঘুষোয় খবর পেলে, তাকে পথ থেকে সরিয়ে কেচ্ দলপতি হ'তে

"আমি ফ্রাঙ্কোইস্ নই, আমি পেরুগিনও নই,—আমি হচ্ছি ডিটেক্টিভ মার্টিন্!"

—১১ পৃষ্ঠা

চায়! দুদিন পরেই পুলিস কেচের মৃতদেহ আবিষ্কার করলে, তার বুকে ছোরার আঘাত!

দুইয়ের নম্বর হচ্ছে, এক জহুরী। আবাদি-সর্দ্দার তার দোকান আক্রমণ করেছিল এবং সে বোকার মত বাধা দিতে গিয়েছিল। তখনি তার মুণ্ড গেল উড়ে।

তিনের ও চারের নম্বর হচ্ছে, এক গৃহস্থ ও তার মেয়ে। আবাদির দলের একজন চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থের বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ে। দিন কয় পরে আবাদি প্রতিহিংসা নেবার জন্যে গৃহস্থ ও তার মেয়েকে হত্যা ক'রে এল।

এই ভাবে পুলিসের গণনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলল।

সারা সহরে হ'ল মহা বিভীষিকার সঞ্চার, কারুরই ধন-প্রাণ আর নিরাপদ নয়। অন্ধকার পাতাল-রাজ্যের কুব্জ-রাজা আবাদি, বয়স তার আঠারো বৎসর মাত্র, কিন্তু এই বিকলাঙ্গ বালকের ভয়ে সকলেই থরথরি কম্পমান!

প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত পুলিসের লজ্জা ও অপমানের সীমা নেই। তারা আবাদির নাম শুনেছে, চেহারার বর্ণনা পেয়েছে, কিন্তু তার ঠিকানা জানেনা। উপরওয়ালাদের কাছে ধমক খেয়ে খেয়ে বড় বড় নামজাদা ডিটেকটিভদের প্রাণ হ'ল ওষ্ঠাগত।

মার্টিন নামে এক ছোক্‌রা তখন গোয়েন্দা বিভাগে সবে ঢুকেছে। সে ভাবলে, আবাদি-সর্দ্দারকে যদি ধরতে পারি, তাহ'লে আমার উন্নতিতে বাধা দেয় কে? সেও তলে তলে খোঁজ নিতে লাগল, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা পেলে না।

... ...

ইতিমধ্যে আর এক খবর শোনা গেল। পেরুগিন নামে এক দুরাত্মা তার খুড়ীকে খুন ক'রে প্রাণদণ্ডের হুকুম পেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সে কারারক্ষীকে হত্যা ক'রে জেল ভেঙে পালিয়েছে! পুলিস সন্দেহ করে, সে নাকি পারিসে এসেই লুকিয়ে আছে! নানান খবরের কাগজে পেরুগিনের চেহারারও বর্ণনা বেরুলো। তার গায়ের জোরও যেমন ভয়ানক, শরীরও তেমনি লম্বা-চওড়া! একে আবাশি-সর্দারকেই নিয়ে লোকের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ, তার উপরে আবার এই খুনে পেরুগিনের কথা শুনে সকলের পিলে গেল চমকে। এখন কাকে রেখে কাকে সামলানো যায়?

পারিসের কোন কোন কফিখানায় ভদ্রলোকেরা প্রাণ গেলেও ঢোকে না। সেখানে কেবল চোর, ডাকাত ও হত্যাকারীর আড্ডা বসে। তোমরা বোধ হয় জানোনা, কলকাতাতেও এই ধরণের কফিখানা আছে, তাদের মালিকরাও গুণ্ডাদের সর্দার।

পারিসের ঐ শ্রেণীর কফিখানায় হঠাৎ একজন নতুন লোকের আবির্ভাব হ'ল। লম্বায়-চওড়ায় চেহারা মস্ত-বড়, সে কারুর সঙ্গেই কথা কয় না, নিজের মনেই খেয়ে-দেয়ে চ'লে যায়।

চোর ও বদমাইসের দলে কৌতূহল জাগল, এই লোকটা কে?

কফিখানার মালিক বললে, "চেহারা আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ও সেই পেরুগিন ছাড়া আর কেউ নয়। খবরের কাগজে আমি পড়েছি, পেরুগিন মার্সিলিসের জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে। —আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রেই দেখা যাক্ না কেন?"

মালিক লোকটির কাছে গিয়ে সুধোলে, "কি হে ভায়া, মার্সিলিস থেকে আসছ নাকি ?"

লোকটি লাফ মেরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "তোর নিকুচি করেছে! যদি এসেই থাকি, হয়েছে কি ?" বলেই সে কোমরবন্ধে হাত দিলে। তার কোমরবন্ধে রয়েছে মস্ত এক ছোরা!

মালিক বললে, "হুঁ, তুমি দেখছি একটি জাঁহাবাজ বাজপক্ষী! বহুৎআচ্ছা, এস তবে, আমার সাঙাতদের সঙ্গে ব'সে খেয়ে-দেয়ে একটু ফুর্ত্তি করবে চল।"

লোকটি নারাজ হ'ল না। দলে গিয়ে মিশল বটে, কিন্তু কথা-বার্ত্তা বড়-একটা কইলে না। নাম জিজ্ঞাসা করাতে বললে, "ফ্রাঙ্কোইস্"। কিন্তু সবাই বুঝলে, তার আসল নাম পেরুগিন্।

আবাদির কাণে এই খবর গেল। সে স্থির করলে, এমন কাজের লোককে হাতছাড়া করা হবে না। তার আড্ডায় ফ্রাঙ্কোইসের নিমন্ত্রণ হ'ল। কিন্তু আবাদি সর্দ্দার বয়সে ছোকরা হ'লে কি হয়, সে মহা হুঁসিয়ার ব্যক্তি। প্রথমেই সে দেখা দিলে না, আগে আড়াল থেকে লুকিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধ'রে ফ্রাঙ্কোইস্‌কে পরীক্ষা করলে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হ'লে পরে সে বেরিয়ে এল।

কিন্তু ফ্রাঙ্কোইস্ প্রথমটা কিছুতেই তার দলে ভর্ত্তি হ'তে রাজি হ'ল না। কয়েকদিন সাধাসাধির ও অনেক লোভ দেখাবার পর শেষটা সে স্বীকার পেল।

ঠিক সেই সময়ে ফ্রান্সের এক মন্ত্রীর বাড়ী লুট করবার জন্যে দলের মধ্যে ষড়্‌যন্ত্র চলছিল। মন্ত্রী-বাড়ীর এক দাসী ছিল আবাদি সর্দ্দারের

চর। সে এসে খবর দিয়েছে, বাড়ীর সমস্ত লোকজন নিয়ে মন্ত্রী বিদেশে হাওয়া খেতে গেছেন, বাড়ীতে আছে খালি সে আর একজন দ্বারবান।

আবাদি ঠিক করলে, প্রথমেই এই ব্যাপারে ফ্রাঙ্কোইস্‌কে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে তার সাহস, বুদ্ধি ও শক্তি পরীক্ষা করবে।

যথাসময়ে সন্ধ্যার পর আবাদি-সর্দারের এক চ্যালা একখানি দামী মোটরগাড়ী চুরি ক'রে নিয়ে এল। আবাদি ও ফ্রাঙ্কোইস্ দস্তুরমত হোম্‌রা-চোম্‌রার মত সাজপোষাক প'রে মন্ত্রীর বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হ'ল।

তখন পথঘাট নির্জ্জন। তাদের সন্দেহ করতে পারে এমন কেউ নেই।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকে আবাদি ও ফ্রাঙ্কোইস্ দেখলে, একখানা আরাম-চেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় দ্বারবান নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছে।

আবাদি তার মোটা লাঠিগাছটা বাগিয়ে ধ'রে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল।

আচম্বিতে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত দ্বারবান একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে আবাদিকে ধ'রে তুলে আছাড় মারলে!

আবাদি মাটির উপরে প'ড়েই চোখের নিমিষে অটোমেটিক রিভলবার বার ক'রে বারংবার ঘোড়া টিপতে লাগল, কিন্তু কী ভয়ানক, ঘোড়া পড়ে, তবু টোটা ফাটে না!

আবাদি চীৎকার ক'রে উঠল, "ফ্রাঙ্কোইস্। গুলি ক'রে ওকে মেরে ফেল!"

কিন্তু দ্বারবানের পাশে দাঁড়িয়ে তার বন্ধু হাসতে হাসতে বললে, "আমি ফ্রাঙ্কোইস্ নই, আমি পেরুগ্গিন্ও নই,—আমি হচ্ছি ডিটেকটিভ মার্টিন। তোমার রিভলবার থেকে আমিই টোটা সরিয়ে ফেলেছি!"

হিংস্র গোখ্রোর মত ফোঁশ্ ক'রে উঠে আবাদি বললে, "ও, তাই নাকি? বেশ, তাহ'লে ধর আমাকে!"...বলেই, সে জামার পকেট থেকে সুদীর্ঘ এক ছোরা বার ক'রে ফেললে।

মার্টিনের সঙ্কেত শুনে তখনি গুপ্তস্থান থেকে পাঁচ জন সশস্ত্র পাহারাওয়ালা আত্মপ্রকাশ করলে।

বিফল আক্রোশে পাগলের মত হয়ে আবাদি দীর্ঘ ছোরাখানা শূন্যে তুলে তীব্র বেগে মার্টিনকে ছুঁড়ে মারলে। এমন তার হাতের টিপ্, যে, মার্টিন সাঁৎ ক'রে স'রে না দাঁড়ালে ছোরাখানা নিশ্চয়ই তার বুকে গিয়ে বিঁধ্ত!

মার্টিন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দুই হাতে আবাদির গলা টিপে ধ'রে বললে "হতভাগা সয়তান! তোকে বধ করলেও কোন পাপ হয় না, কিন্তু তা আমি করব না! নে, এখন হাতকড়ি পর্!"

... ...

মার্টিনের নখদর্পণে ছিল আবাদির সব ঘরের খবর। একে একে তার দলের প্রত্যেকেই ধরা পড়ল।

আবাদিকে অভয় দিয়ে বলা হ'ল, "তুমি যদি সরকারি সাক্ষী হয়ে সব কথা স্বীকার কর, তাহ'লে তোমার দলের সবাইকে শাস্তি দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

সে সদর্পে বললে, "আমি হচ্ছি আবাদি-সর্দার! দলের প্রত্যেককে

রক্ষা করব বলেই আমি সর্দার হয়েছি। আমি তাদের কারুর বিপক্ষেই সাক্ষী হব না, আমার যা হয়, হোক!"

—"তোমাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে তুমি কি করবে?"

—"যা করছিলুম তাই করব। আড্ডায় ফিরে গিয়ে আবার নতুন দল গড়ব।"

বিচারের ফলে, আবাদিকে সুদূর কালিফোর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, কারাবাসের জন্যে।

আবাদি বললে, "তোমরা হুকুম দিয়েছ ব'লেই যে আমাকে যাবজ্জীবন কারাবাস করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমি ঠিক আবার পালিয়ে আসব।"

কিন্তু আবাদি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারে নি। কারাগারেই ক্ষয়-রোগে অকালে তার মৃত্যু হয়।

মানুষ যা চায়, আবাদি নিজের চেষ্টায় সে-সমস্তই অর্জ্জন করেছিল—বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি। কেবল কুপথে গিয়েই সে সব ব্যর্থ করলে।

এক

আজ পর্য্যন্ত অনেক ডাকাত ও খুনীর গল্প শোনা গেছে, কিন্তু ফরাসী ডাকাত বোনোটের ভয়ঙ্কর দলের কাছে সে-সব গল্প হচ্ছে খুব ঠাণ্ডা গল্প!

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বরের সকাল-বেলায় ঝর্-ঝর্ ক'রে বৃষ্টি ঝরছে।

প্যারিসের এক বড় ব্যাঙ্ক সবে দরজা খুলেছে। কেবি ও পীয়্যান নামে ব্যাঙ্কের দুই কর্ম্মচারী কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে এখনি আসবে, কর্ত্তৃপক্ষ তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছেন।

ব্যাঙ্কের কাছেই রাস্তার উপরে একখানা মোটর-গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—তার জান্‌লা-দরজা বন্ধ, কিন্তু মেশিন বন্ধ নয়।

কেবি ও পীব্যাদকে দেখা গেল,—তারা গল্প করতে করতে ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারা ব্যাঙ্কের দরজার কাছে এল। হঠাৎ বন্ধ মোটর-গাড়ীর দরজা খুলে দুজন লোক রাস্তার উপরে লাফিয়ে পড়ল—তাদের হাতে রিভলভার।

তাদের রিভলভার গর্জ্জন করলে—কেবি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। একজন লোক তার হাতের টাকার ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু কেবি আহত হয়েও ব্যাগ ছাড়তে রাজি নয় দেখে সে আবার রিভলভার ছুঁড়ে তাকে একেবারে কাবু ক'রে ফেললে। তারপর সে ব্যাগ নিয়ে একলাফে মোটরের উপর চ'ড়ে বসল।

রাস্তা তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। অনেক লোক মোটরের দিকে ছুটে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটরের ভিতর থেকে দুদিকে দুখানা হাত বেরিয়ে পড়ল—প্রত্যেক হাতেই এক-একটা রিভলভার অগ্নি উদগার করছে! জনতার বীরত্ব উপে গেল—যে যেদিকে পারলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। একখানা লরি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না—মোটরখানা তীরের মতন বেগে তাকে এড়িয়ে চোখের আড়ালে চ'লে গেল।

পুলিসের টনক নড়ল। তাদের চরেরা চারিদিকে খোঁজ নিয়ে এসে খবর দিলে, মোটরের মধ্যে ছিল বোনোট্‌ নামে একজন লোক

ও তার সঙ্গীরা। মোটরখানাও একটা নদীর ধারে পাওয়া গেল—
সেখানা চুরি-করা মোটর।

কিন্তু বোনোটকে পুলিস কিছুতেই আর ধরতে পারে না। সে ভারি চালাক—আজ এ-বাসা, কাল ও-বাসা ক'রে বেড়াতে লাগল, কোথাও দু-একদিনের বেশী থাকে না। পুলিস যখনি খোঁজ পেয়ে তাকে ধরতে যায়, তখনি গিয়ে দেখে বোনোট্ আগেই তাদের ফাঁকি দিয়ে স'রে পড়েছে! এইভাবে এগারো বার সে পুলিসের চোখে ধুলো দিলে।

থিয়েইস্ নামক স্থানে দুজন ধনী লোক বাস করত—স্বামী ও স্ত্রী। এক রাত্রে কারা তাদের খুন ক'রে অনেক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। পুলিস সন্ধান নিয়ে জানলে, এ হচ্ছে বোনোটের দলের কাজ।

একদিন একজন পুলিসের লোক হঠাৎ দেখতে পেলে, চমৎকার একখানা মোটর চালিয়ে বোনোট্ রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে। সে এক-লাফে মোটরের পা-দানীর উপরে উঠে পড়ল—কিন্তু বোনোটের গুলি খেয়ে পরমুহূর্ত্তেই তাকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হ'ল। সে মোটরখানাকেও পরে সহরের একজায়গায় ভাঙা-চোরা অবস্থায় পাওয়া গেল এবং সেখানাও চুরি-করা মোটর।

মাসখানেক পরে কাউন্ট রোগেট তাঁর মোটরে চ'ড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, আচম্বিতে তিনজন বন্দুকধারী লোক এসে গাড়ী থামিয়ে বললে, "গাড়ীখানা এখনি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।"

ড্রাইভার ইতস্ততঃ করলে—সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলিতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। কাউন্ট গাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে

পড়লেন, কিন্তু তিনিও গুলি খেয়ে যত জোরে পারেন পা চালিয়ে দিলেন।

বন্দুকধারীরা হচ্ছে বোনোট্ ও তার দুইজন সঙ্গী। কাউন্টের গাড়ীতে আরো কয়েকজন দলের লোককে তুলে নিয়ে তারা আর এক ব্যাঙ্কের দরজায় এসে দাঁড়াল। তারপর দরজায় দুইজন লোককে পাহারা দেবার জন্যে রেখে তিনজন সঙ্গী নিয়ে বোনোট্ বুক ফুলিয়ে ব্যাঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করল।

তারপর তারা দুচোখা গুলি চালাতে লাগলো। ব্যাঙ্কের তিনজন লোককে হত ও আহত ক'রে ভাণ্ডার লুটে টাকা নিয়ে ডাকাতের দল আবার স'রে পড়ল।

এবারে পুলিশ অনেকটা সাবধান হয়েই ছিল। মোটরে ও মোটর-বাইকে চ'ড়ে দলে দলে পুলিশ ডাকাতদের পিছনে পিছনে ছুটল।

কিন্তু তাদের কাছে যায় কার সাধ্য! গাড়ীর ভিতর থেকে রাশি রাশি গুলি ছুটে আসছে! একটা ষ্টেশনের কাছে এসে ডাকাতরা মোটর থেকে নেমে ট্রেণে চ'ড়ে বসল। পুলিসের লোকেরা পরের ষ্টেশনে গিয়ে তাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তার আগেই পথের একটা বাঁকের মুখে এসে ট্রেণ যখন তার গতি কমিয়ে দিলে, বোনোট্ নিজের লোকজন নিয়ে গাড়ী থেকে অদৃশ্য হ'ল।

প্যারিসের সমস্ত লোক ক্ষেপে উঠে বলতে লাগল—পুলিশ কোন কাজের নয়, তাদের অকর্ম্মণ্যতায় আমরা এইবারে ধনে-প্রাণে মারা পড়ব।

পুলিসের বড়কর্ত্তা প্রমাদ গুণে নিজেই কোমর বেঁধে কার্য্যক্ষেত্রে নামলেন। এমন ভয়ানক সাহসী ডাকাতের কথা তিনি কথনো শোনেন নি। ইচ্ছা করলে এরা অনায়াসেই বিদেশে গিয়ে পুলিসকে কলা দেখাতে পারে, কিন্তু তা' না ক'রে পুলিসের চোখের সামনেই সহরে ব'সে এরা যা-খুসি-তাই করছে। পুলিসের বড়সাহেব বোনোটকে আবিষ্কার করবার জন্যে একশো কুড়িজন ডিটেকটিভ নিযুক্ত করলেন!

দুই

গজির ব্যবসা ছিল চোরাই মাল কেনা! পুলিশ সে খবর রাখত। ডিটেকটিভ জোইন ও কোল্‌মার একদিন সদলবলে গজির বাসায় গিয়ে বললেন, "তুমি নিশ্চয় বোনোটের খবর রাখো। শীগ্‌গির তার ঠিকানা বল।"

গজি বললে, "দোতালায় একটা ঘরে একখানা খাতায় বোনোটের ঠিকানা লেখা আছে। আমি এখনি গিয়ে নিয়ে আসচি।"

জোইন ও কোল্‌মারের কেমন সন্দেহ হ'ল, তাঁরাও গজির সঙ্গে সঙ্গে উপরে গেলেন।

একটা ঘরের সামনে গিয়ে গজি বললে, "ঐ যাঃ, ঘরের চাবিটা নীচে ফেলে এসেছি। আপনারা একটু দাঁড়ান, চাবি নিয়ে আমি এখনি ফিরে আসচি।"—সে আবার একতলায় নেমে গেল।

কিন্তু ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল না, কারণ কোল্‌মার ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল!

জোইন ও কোল্‌মার রিভলভার বার ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন —তৎক্ষণাৎ নিবিড় অন্ধকার ভেদ ক'রে আর একটা রিভলভারের অগ্নিশিখা সশব্দে গ'র্জ্জে উঠল !

কোল্‌মার তখনি সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অন্ধকারেই কাকে দুইহাতে জড়িয়ে ধ'রে মাটির উপরে পেড়ে ফেললেন।

কিন্তু সে কাবু না হয়ে উল্টে রিভলভার ছুঁড়ে কোল্‌মারকেই জখম করলে। তারপর জোইনের পালা! বোনোটের রিভলভার আবার অগ্নিবৃষ্টি করলে, জোইনও ধরাশায়ী হলেন।

রিভলভারের শব্দে নীচে থেকে একজন পুলিসের লোক ছুটে এল। একটা দেশালাইয়ের কাঠি জ্বেলে সে দেখলে, ঘরের মেঝের উপরে রক্তগঙ্গার মাঝখানে তিন-তিনটে মৃতদেহ স্থির হয়ে প'ড়ে রয়েছে। তার পায়ের শব্দ পেয়ে বোনোটও মৃত্যুর ভান ক'রে আড়ষ্ট হয়ে রইল!

পাহারাওয়ালাটা তাড়াতাড়ি খবর দেওয়ার জন্যে আবার নীচের দিকে ছুটল। সেই ফাঁকে উঠে পড়ে বোনোট্ জান্‌লা খুলে বেরিয়ে ছাদে চ'ড়ে চম্পট দিলে।

তিনদিন পরে বোনোট্ গ্রেণঘড্ নামে এক দপ্তরীকে আক্রমণ ও আহত করলে। সে মিথ্যা সন্দেহ করেছিল যে, ঐ দপ্তরীই তার বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে!

তিন

ডুবইস্ ছিল বোনোটের বিশেষ বন্ধু। গোয়েন্দারা খবর পেলে বোনোট্ তার বন্ধুর মোটরগাড়ীর কারখানায় লুকিয়ে আছে।

তখন পুলিসের ফৌজ সেইদিকে ছুটল।

বোনোট্ তখন কারখানার বাইরে একখানা মোটর-বাইকে চড়বার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ পুলিসের আবির্ভাব দেখেই সে বাড়ীর বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ছুটল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারও ছুঁড়তে লাগল। দুজন ইন্‌স্পেক্টর তার অব্যর্থ লক্ষ্যে আহত হলেন। পুলিসের পল্টনও বাড়ী আক্রমণ করলে, কিন্তু অশ্রান্ত গুলিবৃষ্টির চোটে সকলে আবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হ'ল।

কারখানা-বাড়ীটা ছিল একেবারে খোলা জায়গায়। কোনো দিক দিয়েই লুকিয়ে তার কাছে এগুবার উপায় ছিল না।

চারিদিক থেকে খবর পেয়ে দলে দলে লোক বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে ছুটে এল—পুলিসকে সাহায্য করবার জন্যে।

কিন্তু বোনোট্ ও তার স্যাঙাত ডুবইসের রিভলভারের ঘন ঘন গর্জ্জন শুনে কেউই আর বাড়ীর কাছে ঘেঁষতে ভরসা করলে না!

বেলা দশটার সময়ে পুলিস-সাহেব বুঝলেন, কেবল পাহারা-ওয়ালাদের সাহায্যে বোনোট্‌কে বন্দী করা যাবে না! তখন খবর দিয়ে সৈন্যদের আনানো হ'ল।

খড়ে-বোঝাই মালগাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে সৈন্যেরা ডিনামাইট দিয়ে বাড়ীর দেওয়ালের খানিকটা উড়িয়ে দিলে।

কিন্তু তবু বিশেষ সুবিধা হ'ল না। বরং ভাঙা দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বোনোট্ ও ডুবইসের বন্দুক আরো বেশী গুলিবৃষ্টি করবার সুযোগ পেলে!

বৈকাল পর্য্যন্ত সমান যুদ্ধ চলল—একপক্ষে পুলিস-বাহিনী, সৈন্য-

দল ও সারা সহরের বাসিন্দা ও অন্য পক্ষে মাত্র দুটি প্রাণী! এমন যুদ্ধ কখনো হয় নি!

সৈন্যেরা ডিনামাইটের সাহায্যে বাড়ীর আরো-খানিকটা ভেঙে ফেলে তার চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিলে।

তারপর সকলে একসঙ্গে বাড়ীখানাকে আক্রমণ করলে।

বাড়ীর ভিতর থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

নীচের তলায় দেখা গেল, ডুবইসের মৃতদেহ প'ড়ে রয়েচে, তার গায়ে তিন-তিনটে গুলির চিহ্ন! উপর-তালার ভগ্নস্তূপের ভিতরে গিয়ে পুলিস সাহেব প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলেন না।

তারপর দেখলেন, রাশীকৃত আজে-বাজে জিনিসের তলা থেকে একখানা হাত দেখা যাচ্ছে এবং সেই হাতে রয়েছে একটা রিভলভার!

হাতশুদ্ধ রিভলভারটা কাঁপাতে কাঁপাতে উঠে আর-একবার অগ্নি-বৃষ্টি করলে!

সেই সঙ্গে পুলিস-সাহেবও রিভলভার ছুঁড়লেন।

হাতখানা নেতিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

সেই হাত ধ'রে পুলিস-সাহেব বোনোট্‌কে টেনে বার করলেন।

বোনোটের তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। তার দেহের বারো জায়গায় ও মাথার তিন জায়গায় বুলেটের ক্ষতচিহ্ন!

সহরের বাসিন্দারা বোনোটের দেহকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলবার উপক্রম করলে। অনেক কষ্টে তাদের নিবারণ ক'রে বোনোট্‌কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু বিশ মিনিট পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তার জামার ভিতরে পাওয়া গেল এই লেখাটুকু:

"আমি আমারই মত জীবনযাপন করব। প্রত্যেক লোকেরই বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু তোমাদের ঐ পাপী ও নির্ব্বোধ

সমাজ যখন আমাকে বাঁচতে দিতে রাজি নয়, তখন কি আর করা যায়? আমাকে মরতেই হ'ল!"

ছায়া

ডাকাত-সর্দ্দার বোনোট্ মরল বটে, কিন্তু তার ডানহাত ও বাম-হাত এখনো বেঁচে আছে। তার দল এখনো ভাঙে নি।

গার্ণিয়ার আর ভ্যালেট্, এরাই ছিল বোনেটের ডানহাত আর বামহাতের মত।

কিন্তু সারা দেশের চোখে তারা কতদিন ধূলো দিতে পারে? হপ্তাদুয়েক পরে খবর পাওয়া গেল, তারা নদীর ধারে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস করছে। কেবল তাই নয়, দরকার হ'লে লড়াই করবার জন্যে তারা এই বাড়ীখানাকে কেল্লার রসদখানায় পরিণত করেছে এবং এ বাড়ীখানাও এমন জায়গায় আছে যে, কোনোদিক থেকেই লুকিয়ে তার কাছে ঘেঁষ্‌বার উপায় নেই।

তখনি বাড়ীখানাকে অবরোধ করবার ব্যবস্থা হ'ল। চৌদ্দখানা মটর ভর্ত্তি ক'রে পুলিসের লোক ছুটল এবং তাদের সঙ্গে চলল শত শত সৈন্য, কলের-কামান-শ্রেণী ও অনেকগুলো সার্চ্চলাইট। এ যেন কোন দেশজয়ের আয়োজন।

আক্রমণকারীরা যথাস্থানে হাজির হয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, খবর পেয়ে তাদের আগেই হাজার হাজার লোক শত শত মোটরে চ'ড়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে!

তখন রাতের বেলা। উজ্জ্বল সার্চ্চ-লাইটগুলো কিন্তু রাতকেও দিন করে' ফেললে। বড় বড় লোহার থামের আড়ালে দেহ ঢেকে পুলিস ও ফৌজ ডাকাতদের বাড়ী আক্রমণ করলে, কলের কামান-গুলো চেঁচিয়ে লোকের কাণে তালা ধরিয়ে দিতে লাগল, এবং চতুর্দ্দিকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, থেকে থেকে ডিনামাইটের গম্ভীর গর্জ্জনে !

গার্ণিয়ার ও ভ্যালেট্ও হাত গুটিয়ে ব'সে রইল না, তাদেরও বন্দুকের গুলিতে আক্রমণকারীদের কেউ কেউ হত ও আহত হ'ল।

নয় ঘণ্টা ধ'রে যুদ্ধ চলল অশ্রান্তভাবে। অসংখ্যের বিরুদ্ধে মাত্র দুইজনের আত্মরক্ষার এমন কাহিনী কোন ইতিহাসেই লেখা নেই।

রাত চারটের সময়ে বন্দুক, রিভলভার ও কলের কামানের অগ্নি-বৃষ্টিতে ক্ষতবিক্ষত সেই ছোট বাড়ীখানা ডিনামাইটের মুখে প্রায় ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল।

কিন্তু তখনো তার ভিতর থেকে আর একবার বুলেটের ঝড় ছুটে এল—সেই শেষ-বার ! তারপর সব চুপচাপ। পুলিস ও সৈন্যগণ সেখানে গিয়ে পেলে কেবল গার্ণিয়ার ও ভ্যালেটের মৃতদেহ। অসংখ্য গুলির চোটে তাহাদের দেহ ঝাঁজ্‌রা হয়ে গেছে।

কিছুদিনের ভিতরেই বোনোট্-সম্প্রদায়ের আর সব লোকও ধরা পড়ল। অনেকের যাবজ্জীবন জেল হ'ল এবং অনেকে গিলেটিনে প্রাণ দিলে। কেউ করলে আত্মহত্যা।

কিন্তু বোনোটের দলের কেউ কম যায় না। ক্যারুয়ি নামে বোনোটের এক সঙ্গীকে পুলিস গ্রেপ্তার করলে। কিন্তু পাছে সে

আত্মহত্যা করে, এই ভয়ে তাকে উলঙ্গ অবস্থায় জেলখানায় বন্ধ ক'রে রাখা হ'ল। তবু একদিন সে ফাঁক পেয়ে বানরের মত দেওয়াল বেয়ে পাঁচ-তলার ছাদের উপরে গিয়ে উঠল এবং চীৎকার ক'রে বললে, "ঘড়ীতে যেই বারোটা বাজবে, অমনি আমি এখান থেকে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব!"

জেলের কর্ত্তা কাকুতি-মিনতি ক'রে বললেন, "ছিঃ, অমন কাজ কি করতে আছে? লক্ষ্মী-ছেলেটির মতন নীচে নেমে এস!"

ক্যারুয়ি সে কথা আমলেই আনলে না।

জেলের কর্ত্তা তখন পাঁচতলার ছাদে লোক পাঠিয়ে তাকে ধরবার উদ্যোগ করলেন। ক্যারুয়ি তখন কাকুতি-মিনতি ক'রে বললে, "ছিঃ, অমন কাজ কি করতে আছে? বেলা বারোটার আগে কারুকে ওপরে পাঠিও না, তাহ'লে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে যে।"

জেলের কর্ত্তা তার কথা আমলেই আনলেন না, তাকে ধরবার জন্যে লোক পাঠালেন। কিন্তু সে লোক উপরে আসবার আগেই ক্যারুয়ি ছাদ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণত্যাগ করলে!

এই বোনোট ও তার দলবলের কথা মাঝে মাঝে যখন ভাবি তখন মনে হয় যে, বিপথে চালিত হ'য়ে এদের এমন অতুলনীয় বীরত্বও ব্যর্থ হ'য়ে গেল। নিজেদের সাহস ও শক্তির অপব্যবহার না করলে পৃথিবীর শ্রদ্ধা-পূজা লাভ ক'রে আজ হয়ত তারা নিত্য-স্মরণীয় হ'তে পারত।

হিংস্রক পশুজীবন যাপন করে বলেই বাঘ-সিংহকে কেউ বীর ব'লে ডাকে না।

ইয়াঙ্কি ব'লে ডাকা হয় আমেরিকানদের। আর গুণ্ডা কাকে বলে তোমরা সকলেই তা জানো। গুণ্ডা নেই এমন দেশও বোধহয় ছুনিয়ায় নেই। কিন্তু গুণ্ডামিতে এখন সকল দেশের সেরা বোধ করি

ইয়াঙ্কিদেরই দেশ। আজ তাদেরই দেশের বালক-গুণ্ডাদের কথা কিছু-কিছু বলব।

প্রথমে ইয়াঙ্কি গুণ্ডাদের নাম থেকেই সুরু করি। তাদের অনেকেরই ডাক-নাম ভারি মজার। যথা—'খোকামুখো উইলি', 'পঙ্গু চার্চি', 'ক্ষ্যাপা বাচ্', 'মস্ত মাইক্', 'পুচকে মাইক্', 'নকল হাঁস', 'নরকের বিড়াল ম্যাগি', 'হুচি-কুচি মেরি', 'খাই-খাই জোন্স্', 'গ্যু গ্যু নক্স', 'ঝোড়ো লুই', 'ঘুঘু লিজি', 'সিদ্ধ ঝিনুক ম্যালয়', 'পুরুত প্যাডি', 'গলদা-চিংড়ী কিড্,' 'ছেড়া-ন্যাকড়া রিলে' ও 'ওদের-ধ'রে-খাও জ্যাক্' প্রভৃতি।

ওদেশী গুণ্ডাদের আডডাগুলোর নামও চমৎকার। যথা—'আঁস্তাকুড়', 'নরকের রান্নাঘর', 'নরকের গর্ত্ত', 'দেয়ালের গর্ত্ত', 'মড়া-ঘর', 'প্লেগ', 'ধ্বংস', 'গোল্লায় যাবার পথ', 'রক্তের বালতি' ও 'আত্ম-হত্যার ঘর' প্রভৃতি। ঐ সব নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমেরিকার গুণ্ডারা জ্ঞান-পাপী।

অনাথ ছেলেরা লেখাপড়া না শিখিলে ও গুরুজনের উপদেশ না পেলে কি হয়, আমেরিকায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কারণ আমেরিকার গুণ্ডারা গুণ্ডামি করতে শেখে প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। ওখানকার কয়েকটি বিখ্যাত বালক-গুণ্ডাদলের নাম হ'চ্ছে, "চল্লিশ ছোট্ট চোর," "ক্ষুদে মরা খরগোস্", ও "খোকা, গুণ্ডাদল" প্রভৃতি। ঐ-সব দলের ছোকরাদের বয়স আট-দশ-বারোর বেশী না হ'লেও চুরি, জুয়াচুরি, পকেট-কাটা, রাহাজানি ও খুনখারাপি প্রভৃতিতে তারা ধাড়ীদের চেয়ে কিছুমাত্র কম শয়তানি দেখায় নি!

ওদের একটি দলের দলপতির নাম খোকামুখো উইলি, সে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে "গ্রাণ্ড-ডিউক থিয়েটার" নামে একটি রঙ্গালয় খুলে বাহাদুরির পরিচয়ও দিয়েছিল! তারা নিজেরাই নাটক লিখে অভিনয় করত! স্নিন ও সাজপোষাকের জন্যে তাদের কোন ভাবনাই ছিল না, কারণ যা যা দরকার, শহরের বড় বড় থিয়েটারের ভাণ্ডার থেকে চুরি ক'রে আনলেই চলত! এই শিশু-থিয়েটারের দর্শক হ'ত নিউ ইয়র্ক শহরের যত অনাথ বালকবালিকা ও বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলেরা এবং আসনের দাম ছিল মাত্র পাঁচ আনা পয়সা! কিছুদিন থিয়েটার খুব-জোরে চলল। বাচ্ছা গুণ্ডাদের ট্যাকে পয়সা আর ধরে না! কিন্তু তাদের বাড়-বাড়ন্ত অন্যান্য ছোকরা-গুণ্ডাদের দল সইতে পারলে না! তারা অভিনয়ের সময়ে রোজ এসে এমন দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু করলে যে, পুলিস শেষটা শিশু-থিয়েটার উঠিয়ে দিতে বাধ্য হ'ল।

পুঁচকে মাইক্ ব'লে এক ছোক্‌রা-গুণ্ডা মস্ত এক দুষ্ট ছেলের দল গ'ড়ে কিছুকাল বেজায় উৎপাত সুরু করেছিল! তাদের নাম ছিল "উনিশ নম্বর রাস্তার দল।" ও-দলের ছোক্‌রাদের স্বভাব ছিল এম্‌নি ভয়ানক যে, পুলিস পর্য্যন্ত তাদের কাছে ঘেঁষতে চাইত না! তাদের অত্যাচারে সে-অঞ্চলে পাদরীদের ইস্কুল পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত, কারণ ভালো ছেলেরা চোখের সামনে ব'সে পড়াশোনা করবে, এটা তাদের সহ্য হ'ত না! ক্লাস বসলেই তারা বড় বড় ইট-পাথর ছুঁড়ত এবং পুঁচকে মাইক্ ঘরের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে মাষ্টারদের ডেকে বলত, "ওরে বুড়ো পাদরীর দল, তোরা নরকে যা—নরকে যা!"

তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, কোন কোন শিশুগুণ্ডাদলের চাঁই ছিল বালিকা! "চল্লিশ ছোট্ট চোর-দলে"র সর্দ্দারনীর নাম ছিল পাগ্‌লী ম্যাগি কার্সন। নয় বছর বয়সেই সে চল্লিশটি শিশু-চোর নিয়ে শহরের লোকদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। প্রত্যেক শিশু-চোরই তার হুকুমে প্রাণের তোয়াক্কা রাখত না! কিন্তু তার বয়স যখন বারো বৎসর, সেই সময়ে মিঃ পিজ্ নামে এক পাদ্‌রী সাহেব তাকে সদুপদেশ দিয়ে শেলাইয়ের কাজ শেখান। শেলাইয়ের কাজে পাগ্‌লী ম্যাগির এমন মন ব'সে গেল যে, শিশু-গুণ্ডাদের মায়া কাটিয়ে সে একেবারে লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে পড়ল! তারপর এক ভদ্র-পরিবারে আশ্রয় পেয়ে বিয়ে ক'রে সে সুখে দিন কাটিয়ে দেয়।

ক্ষ্যাপা বাচ্ নামে আর এক ছোকরার কীর্ত্তি শোনো। আট বছর বয়সে বাপ-মা হারিয়ে সে হয় অনাথ। তারপর দুষ্টু ছেলেদের দলে ভিড়ে সে একটা কুকুর চুরি ক'রে তার নাম রাখলে র‍্যাবি এবং তাকে হরেক রকম কৌশল শেখালে। রাস্তা দিয়ে মেম-সাহেবেরা হাত-ব্যাগ ঝুলিয়ে চলেছে, কোথা থেকে ঝড়ের মত ছুটে এল র‍্যাবি এবং চিলের মত ছোঁ মেরে হাতব্যাগ মুখে ক'রে দিলে ভোঁ-দৌড়! তারপর র‍্যাবি ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একেবারে মনিবের কাছে গিয়ে হাজির!

ক্ষ্যাপা বাচ্ আরো ঢের ফন্দি জানত। সেও একটা ছোট-খাটো চোরের দল গ'ড়ে তুলেছিল। এবং তার কার্য্যপদ্ধতি ছিল এইরকম। বিশ-ত্রিশ-জন শিশু পকেটমার নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়ত। নিজে যেত বাইসাইকেলে চ'ড়ে। পথে কোন বুড়ী বা দুর্ব্বল লোক দেখলেই

ক্ষ্যাপা বাচ্ তার গায়ে ইচ্ছা ক'রে বাইসাইকেলের ধাক্কা লাগিয়ে দিত এবং তারপর গাড়ী থেকে নেমে প'ড়ে চেঁচিয়ে এমন গালাগালি সুরু করত যে, মস্ত ভিড় জ'মে যেত। কৌতূহলী লোকেরা যখন ব্যাপার কি জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠত, তখন ক্ষ্যাপা বাচের স্যাঙাতরা সকলের পকেটে সুপটু হাত চালিয়ে টপাটপ্ মণিব্যাগ প্রভৃতি তুলে নিয়ে স'রে পড়ত! বলা বাহুল্য, দলের প্রধান পাণ্ডা ব'লে লাভের অংশ বেশীর ভাগই হ'ত তার পাওনা।

তোমরা পকেটমারের ইস্কুলের নাম শুনেছ?...না? কিন্তু আমেরিকায় সত্যি-সত্যিই এই ইস্কুল ছিল, আজও হয়তো আছে!

কোন দাগী পুরাণো ও বয়স্ক গাঁটকাটা হয় এর মাস্টার। রাজ্যের ক্ষুদে বদমাইসরা হয় এর ছাত্র। ক্লাসে সাজানো থাকে নানান ভঙ্গিতে সারে সারে সাজ-পোষাক-পরানো মূর্ত্তি। ছাত্রেরা সাবধানে সেই-সব মূর্ত্তির পকেট কেটে বা পকেটে হাত চালিয়ে জিনিষ তুলে নিতে চেষ্টা করে। প্রায়ই এমন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, পকেটের ভিতরে জামার কাপড়ে হাত লাগলেই টুং-টুং ক'রে ঘণ্টা বেজে ওঠে। পকেট কাটতে গিয়ে ছাত্রদের এরকম কোন ভুল হ'লেই মাষ্টার-চোর পাহারাওয়ালার পোষাক পরে এসে সপাসপ্ বেত মারতে থাকে!

ছোক্‌রা-গুণ্ডাদের দলে এক-একজন ভীষণ প্রকৃতির লোকও দেখা গেছে। যেমন গোবর-গণেশ লুই। নাম তার গোবরগণেশ বটে, কিন্তু গোঁফ ওঠবার আগেই সে মানুষ খুন করতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। খুব ভালো পোষাক প'রে সর্ব্বদাই সে ফিট্‌ফাট্ হয়ে থাকত বটে, কিন্তু তার মনের ভিতরটা ছিল নোংরা ও ভয়াবহ।

কিড্ টুইষ্ট্ আমেরিকার এক নামজাদা গুণ্ডা-সর্দ্দার। বয়সে, গায়ের জোরে ও সহায়-সম্পদে সে লুইয়ের চেয়ে ঢের বড়। লুই কিন্তু এম্নি ডান্‌পিটে ছেলে যে তাকেও গ্রাহ্য করত না। যে-টুইষ্টের নাম শুনলে মহা-ধড়ীবাজ ইয়াঙ্কি ডাকাতরা পর্য্যন্ত পালিয়ে যায়, লুই একদিন তার সঙ্গেই ঝগড়া ক'রে বসল! অথচ সেদিন টুইষ্টের সঙ্গে ছিল ঝোড়ো লুই নামে আর একজন এমন ষণ্ডা গুণ্ডা, যে হাতের চাপে মানুষকে ভেঙে দুখানা ক'রে ফেলতে পারত।

ঝগড়াটা বাধল এক হোটেলের দোতলায়। কিড্ টুইষ্ট্ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "ওহে ছোক্‌রা, শুনেছি তুমি খুব চট্‌পটে! আচ্ছা, এখনি ঐ জানালা দিয়ে রাস্তায় লাফ্ মারো দেখি!"

লুই বেচারা একলা মারামারি করতেও পারলে না, অত-উঁচু থেকে তার লাফ মারবারও ভরসা হ'ল না! সে ইতস্তত করতে লাগল।

কিড্ টুইষ্ট্ চোখ রাঙিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বার করতে উদ্যত হ'ল। তখন লুই আর কি করে, বাধ্য হয়ে জান্‌লা থেকে মারলে এক লাফ!

অল্প বয়স, হাল্‌কা দেহ, কাজেই দোতালা থেকে নীচে প'ড়েও তার খুব বেশি লাগল না। কিন্তু সে গুণ্ডা-সর্দ্দার টুইষ্টের উপরে মর্ম্মান্তিক চ'টে গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে শুনতে পেলে, উপরে ব'সে টুইষ্ট্ হেঁড়ে-গলায় অট্টহাস্য করছে! লুই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে সে জলগ্রহণ করবে না!

তখনি সে ফোন করে দলের জন-ছয়েক লোককে আনিয়ে হোটেলের দরজার কাছে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক পরেই দেখা গেল কিড্ টুইষ্ট্ ও ঝোড়ো লুই সকলের সভয় সেলাম কুড়োতে কুড়োতে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে।

গোবর-গণেশ লুই হেসে বললে, "কিড্ এইদিকে এস।"

কিড্ টুইষ্ট্ মুখ তুলে তাকাতে-না-তাকাতেই লুই রিভলভারের

দুই গুলিতে তার মাথা ও বুক ছ্যাঁদা ক'রে দিল! পর-মুহূর্ত্তে তার মৃতদেহ পথের উপরে প'ড়ে গেল।

ঝোড়ো লুই বেগতিক দেখে পালাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু গোবর-গণেশের সাঙ্গোপাঙ্গরা তাকেও কুকুরের মত গুলি ক'রে মেরে ফেললে!

একজন পাহারাওয়ালা দৌড়ে এল, কিন্তু গোবর-গণেশের রিভলভার আবার গর্জ্জন করতেই সে বুদ্ধিমানের মত চট্‌পট্‌ স'রে পড়ল।

কিছুদিন পরে গোবর-গণেশ যেচে পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করলে।

বিচারক তার নিতান্ত কাঁচা বয়স দেখে তাকে এগারো মাসের জন্যে সংশোধনী কারাগারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

গোবর-গণেশ লুই অবহেলা-ভরে বললে, "মোটে এগারো মাস? ওঃ, ভারি তো! আমি শূন্যে পা তুলে মাথার উপর ভর্ দিয়েই এগারো মাস কাটিয়ে দিতে পারি।"

আর এক ছোক্‌রা-গুণ্ডার গল্প ব'লে আমরা এবারের পালা শেষ করব। তার নাম হচ্ছে ওনি ম্যাডেন। কিন্তু লোকে তাকে ডাকে 'খুনী ওনি' ব'লে।

বিলাতে তার জন্ম। এগারো বছর বয়সে সে আসে আমেরিকায়। সতেরো বছর বয়সেই সে 'খুনী ওনি' নাম অর্জ্জন করে। তার মারাত্মক বীরত্ব দেখে বড় বড় ইয়াঙ্কি গুণ্ডারা মুগ্ধ হয়ে তার দলে গিয়ে

ভর্ত্তি হয়। তারপর একে একে পাঁচটা নরহত্যা ক'রে খুনী ওনি সর্ব্বপ্রথম পুলিসের পাল্লায় প'ড়ে জেল খাটে।

খুনী ওনি যখন পথে বেরুত, তখন তার সঙ্গে থাকত অনেকরকম অস্ত্রশস্ত্র। প্রথম বার জেল খাটবার আগে সে কখনো শারীরিক পরিশ্রম করে নি। সারাদিন ঘুমিয়ে থাকত এবং সারারাত হোটেলে খেচে-গেয়ে ফুর্ত্তি ক'রে বেড়াত। টাকার দরকার হ'লেই রাহাজানি ও নরহত্যা করত—যাকে বলে আদর্শ হিংস্র পশুর জীবন।

জেল থেকে বেরিয়ে সে আবার দুটি মানুষকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। পুলিস আবার তার পিছনে লাগে। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে তাকে ধরতে পারে না।

খুনী ওনি বুঝলে, এখন দিন-কয়েকের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে ভালো-মানুষ সাজা উচিত। সে তখন কয়েকজন সাঙাতকে নিয়ে ভদ্র-পাড়ায় একখানা বাড়ী ভাড়া করলে—বাড়ীওয়ালার নাম কিটিং। সে সাধু ও গৃহস্থ ব্যক্তি। ভাড়াটেরা কোন্ শ্রেণীর লোক, ঘুণাক্ষরেও তা কল্পনা করতে পারে নি।

কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে! বিশেষ বাঘ আর কতদিন শান্ত হয়ে থাকতে পারে? খুনী ওনি আর তার চ্যালা-চামুণ্ডারা সারা রাত নেচে-কুঁদে, হট্টগোল ক'রে এত-বেশী ফুর্ত্তি করতে লাগল যে, পাড়ার ভদ্রলোকদের পক্ষে আশেপাশে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠল।

একদিন সন্ধ্যায় তারা গান-বাজনা আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে বাড়ীওয়ালা কিটিং এসে হাজির।

বিরক্তমুখে ভারিক্কে চালে কিটিং বললে, "পাড়ার লোকে রাগ

করছে। আমার বাড়ীতে এত গোলমাল করলে আমি তোমাদের উঠিয়ে দেব।”

ভারি মিঠে হাসি হেসে ওনি বললে, “বলেন কি মশাই, আমাকে আপনি উঠিয়ে দেবেন ?······বেশ, বেশ। আচ্ছা, আপনি কি ওনি ম্যাডেনের নাম শুনেছেন ?”

—“খুনী ওনি ? তার নাম কে শোনে নি ?”

—“বেশ, বেশ। তাহ’লে আর একটা নতুন খবর শুনে রাখুন। আমারই নাম খুনী ওনি।”

কিটিং-বেচারা আর একটাও কথা কইলে না, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে গেল। তারপর আর কোন হট্টগোলই সে কাণে তুললে না, পুলিসেও খবর দিলে না। কারণ সে জানত, খুনী ওনিকে ধরিয়ে দিলে তার দলের লোকেরা এসে তাকে টিপে মেরে ফেলবে।

কিন্তু সে চুপ ক’রে থাকলে কি হবে পাড়া-পড়্‌সীদের আর সহ্য হ’ল না। থানায় খবর গেল। একজন পাহারাওয়ালা তদারক করতে এল। কিন্তু, সে এসেই যেই শুনলে ভাড়াটের নাম খুনী ওনি, অমনি চোখ কপালে তুলে স’রে পড়ল।

তারপর পুলিস এল সদলবলে, সশস্ত্র হয়ে। কিন্তু খুনী ওনি তো সহজ ছেলে নয়, সহজে ধরাও দিলে না। রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধের পরে তবেই পুলিস খুনী ওনি ও তার বন্ধুদের পাকড়াও ক’রে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যেতে পারলে।

পরদিনেই বিচার। জজ-সাহেব কিন্তু খুনী ওনিকে নাবালক দেখে তাকে সৎপথে থাকতে উপদেশ দিয়ে মুক্তি দিলেন!

গুণ্ডাদের জগতে খুনী ওনির শত্রুও ছিল ঢের, কারণ অনেকে তাকে হিংসা করত।

একদিন এক নাচঘরে খুব নাচ-গান চলছে, শত শত লোক আমোদ করছে, এমন সময়ে খুনী ওনি ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করল তাকে দেখেই সবাই ভয়ে তটস্থ, নাচ গেল থেমে এবং অনেকেই পালাবার উপক্রম করলে।

ওনি সবাইকে অভয় দিয়ে হেসে বললে, "তোমরা যত-খুসী নাচো—গাও—আমোদ কর। ভয় নেই, আজ আমি মারামারি করতে আসি নি।" আবার নাচ সুরু হ'ল, খুনী ওনি নিতান্ত নিরীহের মতন ব'সে ব'সে নাচ দেখতে লাগল।

কিন্তু তখনি তার শত্রুমহলে খবর র'টে গেল যে, খুনী ওনি আজ একলা পথে বেরিয়েছে।

এগারো জন শত্রু নাচঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ওনি বাইরে আসতেই এগারোটা রিভলভার গুলি বৃষ্টি করলে। ছয়টা গুলি ওনির গায়ে ঢুকল—সে রাজপথে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল।

হাসপাতালে পুলিস যখন জিজ্ঞাসা করলে, "কারা তোমাকে মেরেছে?" ওনি তখন বললে, "সে কথায় তোমাদের দরকার কি? কারুর নাম আমি বলব না। আমার চ্যালারাই তাদের শাস্তি দেবে!"

ওনি মিথ্যে জাঁক দেখায়নি। হপ্তাখানেকের মধ্যেই তার এগারো জন শত্রুর মধ্যে তিনজনকে পরলোকে প্রস্থান করতে হ'ল।

এবং ওদিকে ছয়-ছয়টা গুলি খেয়েও খুনী ওনি মরল না। কিছু-দিন পরে সে আবার সুস্থ দেহে হাসপাতাল থেকে ফিরে এল!

ইয়াঙ্কি গুণ্ডাদের গল্প তোমাদের হয়তো ভালোই লাগচে; তোমাদের মধ্যে যারা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' খোঁজ তারা হয়তো ভাবছো, কী মজার ওদের জীবন। কিন্তু তোমরা হয়তো জানোনা যে, গুণ্ডারা প্রায় সকলেই জীবনে কখনো সুখী হ'তে পারে না। অধিকাংশ গুণ্ডারই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের ভিতরেই প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়; অনেকে যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করে; যারা পুলিসকে ফাঁকি দেয় তারা অনেকেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা নিজেদের মধ্যেই মারামারি ক'রে অল্প বয়সেই মারা পড়ে। দীর্ঘজীবী গুণ্ডা জেলখানার বাইরে খুব কমই দেখা যায়। যে দুচারজন বাঁচে, তারা প্রভুত্ব ও শক্তি হারিয়ে প্রায় ভিখারীর মত কষ্ট পায়, কারণ কোন গুণ্ডারই আধিপত্য বেশি দিন থাকে না। পরলোকের কথা কেউ জানে না। কিন্তু ইহলোকেই বেশির ভাগ গুণ্ডার পরিণাম হয় ভয়ঙ্কর। সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপনের পক্ষে পৃথিবীতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে সৎপথ, এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

ফরাসী বিপ্লবে বাঙালীর ছেলে

ক

কিছু কম দু'শো বছর আগেকার কথা।

পৃথিবীর স্থলপথে তখন ডাকাতদের ভিড় আর জলপথে বোম্বেটেদের জয়যাত্রা।

পৃথিবীর দেশে দেশে তখন দাস-ব্যবসা চলছে পুরো-দমে। বোম্বেটেরা জলে করত যাত্রীদের জীবন ও সর্বস্ব হরণ এবং আফ্রিকায় ডাঙায় নেমে করত কালো মানুষ চুরি। লাল মানুষদের দেশ আমেরিকায় উড়ে গিয়ে জুড়ে ব'সে সাদা মানুষরা গোলাম আর কুলির কাজে খাটাবে ব'লে এই সব কালো মানুষকে দাম দিয়ে কিনে নিত।

কালো মানুষ বলতে সাধারণতঃ বোঝায় কাফ্রীদের। হতভাগ্য কাফ্রী জাতি। ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই দেখি, পৃথিবীর

অধিকাংশ সভ্য দেশেই কাফ্রীরা বন্দী হয়ে গোলামরূপে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটছে! রোমে, আরবে—এমন কি ভারতেও রাজা-বাদশা ও বড়লোকদের ঘরে ঘরে কাফ্রী গোলাম রাখার প্রথা ছিল।

আঠারো শতাব্দীতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সম্ভ্রান্ত সমাজের সুন্দরী বিলাসিনীরাও সখ ক'রে কাফ্রী গোলাম পুষতেন। গোলামদের গায়ের রং সাদা নয় ব'লে তাদের মানুষ ব'লেই মনে করা হ'ত না। আমরা যেমন কুকুর, বিড়াল ও পাখীদের আদর ক'রে পুষি, অথচ তাদের উচ্চতর জীব ব'লে মনে করি না, য়ুরোপীয় সৌখীন মেয়েরাও ঐ কাফ্রী গোলামদের সেই ভাবেই দেখতেন। দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়নের ছোট বোন পলিন স্পষ্টই ব'লেছিলেন, "কাফ্রীদের সামনে আবার লজ্জা করব কেন? কাফ্রীরা মানুষ নাকি?"

আর একটা কথা জানিয়ে রাখি। য়ুরোপীয় সুন্দরীদের কাছে তখন সব চেয়ে বেশী আদর ছিল, কাফ্রী-জাতের ছোক্‌রা গোলামদের।

৩

বাঙালীদের রং কাফ্রীদের মতন কালো নয় বটে, কিন্তু তামাটে। সাহেবদের চোখে তামাটে ও কালো রঙের মধ্যে কোন তফাৎ ধরা পড়ে না। তারা দুই রংকেই এক ব'লে ধ'রে নিয়ে গালাগালি দেয়। অথচ পর্ত্তুগাল ও স্পেনের অনেক য়ুরোপীয়েরও গায়ের রং অনেক ভারতবাসীর চেয়ে কালো। কিন্তু য়ুরোপে জন্মেছে ব'লে তারা কালো হ'লেও কালো নয়!

প্রায় দুশো বছর আগে বাংলায় ছিল ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের বিষম দৌরাত্ম্য।

পূর্ব্ব-বাংলা নদনদীপ্রধান ব'লে ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা সেইখানেই অত্যাচার করবার সুবিধা পেত বেশী। তারা নৌকায় ও ছোট ছোট জাহাজে চ'ড়ে নদী বেয়ে দেশের ভিতরে ঢুকত। মাঝে মাঝে ডাঙায় নেমে গ্রাম বা সহর লুট ক'রে আবার পালিয়ে যেত। বোম্বেটেদের জ্বালায় পূর্ব্ব-বাংলা তখন অস্থির হয়ে উঠেছিল।

একদিন শ্যামল বাংলার এক কালো শিশু হয়তো গ্রামের পথে বা নদীর ধারে আপন মনে নেচে খেলে বেড়াচ্ছিল; কিংবা হয়তো সে স্নেহময়ী মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে খেলার স্বপন দেখছিল। হয়তো তার নাম ছিল কালু বা ভুলু, কানাই বা বলাই। হয়তো সে ছিল বাঙালী মুসলমানের ছেলে—তার নাম ছিল করিম বা অন্য কিছু। এ-সব বিষয়ে ঠিক ক'রে আমি কিছু বলতে পারি না। কারণ ইতিহাস এ-সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস কেবল বলে, ঐ অনামা খোকাটি বাংলারই ছেলে।

গ্রামে হানা দিতে এসে ফিরিঙ্গী বোম্বেটের শনির দৃষ্টি পড়ল হঠাৎ সেই খোকাটির উপরে। তাদের মনে প'ড়ে গেল, য়ুরোপের সুন্দরী-মহলে কৃষ্ণবর্ণ শিশু-গোলামের ভারি আদর। এ কাফ্রী-শিশু নয় বটে, কিন্তু রং যার সাদা নয়, তাকে কাফ্রী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

বোম্বেটেরা বাংলার সেই দুলালকে চুরি ক'রে পালিয়ে গেল।

সেদিন সেই শিশু মাকে হারিয়ে এবং তার মা কোলের ছেলেকে হারিয়ে কত কেঁদেছিল, ইতিহাস তার বর্ণনা করে নি, কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি। আরো কল্পনা করতে পারি, সেখানকার সেই কান্না সারাজীবনই জেগে ছিল তার বুকের ভিতরে। এবং যারা তার

এই কান্নাকে স্থায়ী করেছিল, সে যে তাদের ক্ষমা করতে পারে নি, এটাও আমরা জানতে পারব যথাসময়ে।

গ

চল, তোমাদের কত সাগর কত নদীর ওপারে, কত যুগ আগেকার নতুন দেশে নিয়ে যাই।

দেশের নাম হচ্ছে ফ্রান্স। দুশো বছর আগে য়ুরোপে ফ্রান্সের তুলনা ছিল না। ফরাসীরা যে খাবার খায়, সারা য়ুরোপ তাই খেতে ভালবাসে; ফরাসীরা যে-পোষাক পরে, সারা য়ুরোপ তারই নকলে সাজগোজ করে।

এই বিখ্যাত দেশের মস্ত রাজা তখন পঞ্চদশ লুই। একদিকে লুই যে নির্দ্দয় রাজা ছিলেন, তা নয়; কিন্তু রাজা হ'তে গেলে যে-যে গুণের দরকার, পঞ্চদশ লুইয়ের মধ্যে তা ছিল না। তিনি রাজকার্য্য দেখতেন না, সর্ব্বদাই তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। ফলে ফ্রাস হয়ে পড়ে অরাজক দেশের মত এবং প্রজাদের হয় অত্যন্ত দুরবস্থা। এইজন্যেই পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে প্রজারা ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহী হয়ে রাজা-রাণী ও আমীর-ওমরাদের হত্যা করে। ইতিহাসে ঐ-সব ঘটনা ফরাসী বিপ্লব নামে বিখ্যাত।

কাউন্ট দ্যু'ব্যারীর বউয়ের সঙ্গে পঞ্চদশ লুইয়ের অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয় —সে ম'দাম দ্যু'ব্যারী নামে সুপরিচিত।

দ্যু'ব্যারী ছিল খুব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। রাজা তার গল্প শুনতে

ভালোবাসেন, তার পরামর্শে ওঠেন বসেন। দ্যু'ব্যারীর মুখের কথায় বড় বড় ওমরাকে রাজপদ থেকে বঞ্চিত করা হয়, আবার তার একটি ইঙ্গিতে পথের ভিখারীও আমীর হয়ে দাঁড়ায়! সকলেই তার অনুগ্রহ লাভের জন্যে ব্যস্ত। কারণ আগে সে খুসি না হ'লে রাজা খুসি হন না!

দ্যু'ব্যারী রাজবাড়ীরই এক মহলে থাকে। রাজা নিত্য তাকে দামী দামী ভেট পাঠান। নয় মণ ওজনের সোনার তাল এনে রাজা তার 'ড্রেসিং টেবিলে'র আসবাব গড়িয়ে দিলেন! তার এক একটি পোর্সিলেনের কফির পিয়ালার দাম হাজার হাজার টাকা। তার জামা-কাপড়ের দাম যে কত লক্ষ টাকা, সে হিসাব রাখা অসম্ভব। তার জড়োয়া গহনার বিনিময়ে একটি রাজ্য বিকিয়ে যায়! এই ভাবে দ্যু'ব্যারীর মন রাখবার জন্যে রাজা দু-হাতে প্রজার টাকা খরচ করেন। রাজ্যময় অভাবের হাহাকার, কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে কেড়ে-আনা অর্থে দ্যু'ব্যারীর প্রমোদ-কক্ষ আলোকোজ্জ্বল! দ্যু'ব্যারীর নাম শুনলে প্রজারা জ্বলে ওঠে!

একটা তুচ্ছ নারীর শক্তি রাজার চেয়েও বেশী দেখে দেশের আমীর-ওমরারাও দ্যু'ব্যারীর উপরে খড়গহস্ত হয়ে উঠল।

দ্যু'ব্যারীর একটি কাফ্রী খোকা-গোলাম পোষবার সখ হ'ল। বাজার থেকে তখনি একটি গোলাম কিনে আনা হ'ল—যেমন ক'রে কিনে আনা হয় বানর বা কুকুর।

সে হচ্ছে ফিরিঙ্গীদের চুরি-ক'রে-আনা আমাদের সেই বাংলার অনামা ছেলে।

৯

সোনার খাঁচায় বন্দী করলে বনের পাখী কি খুসি হয়? দেশ থেকে নির্বাসিত হ'য়ে বাপ-মায়ের আদরের কোল হারিয়ে বাংলার ছেলে ফিরিঙ্গী রাজবাড়ীর গোলামী পেয়ে কি খুসি হয়েছিল? একটু পরেই আমরা জানতে পারব!

গোলামকে দ্যু'ব্যারীর ভারি পছন্দ হ'ল! পোষা কুকুরকে নাম দিতে হয়, নতুন গোলামকে কি নামে ডাকা যায়?

সবাই সুধোয়, "ওরে, তোর নাম কি?"

বাঙালীর ছেলে, ফরাসী ভাষা জানে না, কাজেই চুপ ক'রে থাকে।

তখন একজন প্রিন্স্ তার নাম দিলেন, 'জামোর'। ইতিহাসে বাংলার ছেলে এই নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে।

দ্যু'ব্যারীর কৃপায় জামোর খাঁটি সোনার কাজ করা বহুমূল্য পোষাক পেলে। তার জন্যে ব্যবস্থা হ'ল ভালো ভালো খাবারের। রাজবাড়ীর ঘরে ঘরে দ্যু'ব্যারীর আদরের দুলাল হেসে-নেচে-খেলে বেড়ায়। যেখানে আমীর-ওমরার প্রবেশ নিষেধ, সেখানেও জামোরের অবাধ গতি! আমীর-ওমরারা জামোরকে প্রসন্ন রাখতে ব্যস্ত, কারণ সে দ্যু'ব্যারীর প্রিয়পাত্র। দ্যু'ব্যারী এক মিনিটও তাকে চোখের আড়ালে রাখতে পারেন না—এত তাকে ভালবাসেন!

কিন্তু বাংলার ছেলে জামোর কি বুঝতে পারে নি, দ্যু'ব্যারী নিজের পোষা কুকুরকেও তার চেয়ে কম ভালোবাসেন না?

সাধারণ লোকেরা জামোরকে কাফ্রী ব'লেই জানত। কিন্তু ঐতিহাসিকরা স্পষ্ট ভাষায় তাকে "native of Bengal" ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর Decrenze দ্যু'ব্যারীর সঙ্গে জামোরের একখানি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন। দ্যু'ব্যারী কফির পেয়ালা নিয়ে পান করছেন, আর বালক জামোর ঠিক প্রিয় কুকুরের মত কর্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে 'ট্রে' হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার রং কালো বটে, কিন্তু তার নাক-মুখ চোখে 'কাফ্রীত্ব নেই। রাজচিত্রকর স্বচক্ষে জামোরকে দেখেই তার মূর্ত্তি এঁকেছিলেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক গণ্‌কোর্ট এই ব'লে জামোরের বর্ণনা করেছেন; "তাকে বিকটাকার মনুষ্যত্বের নমুনারূপে দেখা হ'ত। সে সকলকে জলখাবারের থালা জোগাত, মেয়েদের ছাতা বহন করত, খুসি হ'লে ডিগবাজি খেত। আঠারো শতাব্দীর বিজাতীয় রুচি এই শ্রেণীর ছোট্ট বিকৃতাকার জীবকে অত্যন্ত পছন্দ করত এবং নিগ্রোদের ভাবত ক্ষুদ্র দু পেয়ে জন্তর মত।"

বাংলার ছেলে জামোর ফ্রান্সে থেকে নিশ্চয়ই ফরাসী ভাষা শিখেছিল। এবং সে যখন শুনত, তাকে বিকটাকার কাফ্রী ও দু-পেয়ে জন্তুর মতন দেখা হয় তখন তার মন কি কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত? এত সানুগ্রহ সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য কি তখন তার সর্ব্বাঙ্গে বিষাক্ত কাঁটার মত বিঁধত না? শীঘ্রই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

বাঙালী হচ্ছে কাফ্রী। বাঙালী হচ্ছে দু-পেয়ে জন্তু। কেননা তার চামড়া কটা নয়।

৬

ফ্রান্সের রাজার ছিল অনেক প্রাসাদ এবং প্রত্যেক প্রাসাদেই সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে থাকতেন একজন ক'রে গভর্ণর। গভর্ণরের পদে তখন পদবীওয়ালা সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া আর কারুকে বসানো হ'ত না। একদিন রাজার কাছে দ্যু'ব্যারী আবেদন জানালে, "মহারাজ, আপনার লুসিয়েনেস্‌ প্রাসাদে গভর্ণরের আসন খালি হয়েছে। আমার জামোরকে ঐ আসনে বসাতে চাই!"

পঞ্চদশ লুই চম্‌কে উঠে বললেন, "বল কি! সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া আর কেউ যে গভর্ণরের পদ পায় না। জামোর গভর্ণর হ'লে অন্য অন্য গভর্ণরদের মান কোথায় থাকবে? রাজ্যের লোক কি মনে করবে?"

দ্যু'ব্যারী বললে, "রাজ্যের লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না! এখানকার আমীর-ওমরারা আমার শত্রু! আমি তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, আমার চোখে তারা জামোরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়!"

রাজা হেসে বললেন, "বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! এস জামোর, আজ থেকে তুমি গভর্ণর! তোমার মাহিনা হ'ল চারশো টাকা!"

সে যুগে চারশো টাকার দাম এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল!

যে-দেশে জামোরের জন্ম, সেখানে পশু-বানরের বিবাহে কোন কোন মানুষ-বানর লাখ টাকা খরচ করেছে! সে-ও পোষা কুকুর-বিড়ালের মতন জীবন্ত খেলনা, তাকে গভর্ণরের পদে বসিয়ে তার মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখানো হ'ল না, বরং তার নীচতাকে যে উঁচু ক'রে তুলে ধরা হ'ল দেশের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাথা নীচু

করবার জন্যেই, এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি যে বাঙালীর ছেলে জামোরের ছিল না, এ-কথা মনে করা চলে না।

গণ্‌কোর্ট হয়তো সেইজন্যেই বলেছেন, "প্রাসাদ হ'ল গভর্ণর জামোরের বনের পাখীর সোনার খাঁচার মত!"

'বিকটাকার মানুষ', 'দু-পেয়ে জন্তু' জামোর মহামান্য গভর্ণর হয়ে মুখে নিশ্চয় একগাল হেসেছিল, কিন্তু তার অপমানিত মনের মধ্যে কী প্রতিহিংসার আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, পরের দৃশ্যেই আমরা তা দেখতে পাব!

৮

পরের দৃশ্যের যবনিকা তুললুম প্রায় বিশ বৎসর পরে।

ইতিমধ্যে পঞ্চদশ লুই মারা পড়েছেন, ষোড়শ লুই কয়েক বৎসর রাজ্য ক'রে পূর্ব্বপুরুষদের পাপে নির্দ্দোষ হয়েও বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে রাণীর সঙ্গে প্রাণ দিয়েছেন।

সমস্ত ফরাসী জাতি রক্ত-পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সকলেরই মুখে এক কথা,—"এতদিন ধ'রে যারা প্রজাদের রক্ত শোষণ করেছে, আমাদের অনাহারে রেখে আমাদেরই কষ্টার্জ্জিত অর্থে বিলাসের খেলনা কিনেছে, আজ তাদের রক্ত চাই!"

জামোর সেদিন রাজবাড়ীতে ছিল না,—ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে! সে আর বালক নয়, পূর্ণবয়স্ক যুবক। সেদিন সে আর কারুর গোলাম নয়, বাংলার সুনীল আকাশেরই মতন স্বাধীন! সেদিন সে ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছে, তাকে 'দু-পেয়ে জন্তু' ভেবে এতদিন কারা তার মনুষ্যত্বকে ব্যঙ্গ করেছে!

বিচারালয়ের কাঠগড়ায় উঠে বন্দিনী দ্যু'ব্যারী সভয়ে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, রাজ-বাড়ীর পোষা জ্যান্তো খেলনা, বিকটাকার মনুষ্যত্বের নমুনা জামোর! আজ জামোরের মুখে কৃপাপ্রার্থী আবদারের হাসি নেই, তার দুই চক্ষে জ্বল্-জ্বল করছে বাংলাদেশের মুক্ত জাগ্রত মনুষ্যত্বের প্রতিহিংসা-বহ্নি!

জামোর একে একে দ্যু'ব্যারীর সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে দিলে।

ছয়

শেষ দৃশ্য।

চারিদিকে বিপুল জনতা। সকলেই চীৎকার করছে—"মার্, মার্। যারা মনুষ্যত্বকে মর্য্যাদা দেয় নি, গরিবকে মানুষ ভাবে নি, তাদের সকলকে হত্যা কর্।"

গিলোটিনের তলায় হাড়িকাঠে গলা দিয়ে অভাগিনী দ্যু'ব্যারী সকাতরে চেঁচিয়ে উঠল, "বাঁচাও, বাঁচাও। দয়া কর। আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করব।"

ভিড়ের ভিতর থেকে নিষ্ঠুর ভাষায় কে বললে, "তোমার যথা:-সর্ব্বস্ব তো প্রজাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি।"

গিলোটিনের খাঁড়া নেমে এল। দ্যু'ব্যারীর ছিন্নমুণ্ড আর কোন কথা কইলে না।

এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। জনতার ভিতরে কি জামোরও ছিল?

জানি না।

ইতিহাস আর তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি।

শিকল-পরা বাঙালী গোলাম জামোর ফরাসীদের সাহিত্যে ও চিত্রকলায় অমর হয়ে আছে। কিন্তু গোলামীর শিকল খুলে স্বাধীন জামোর কোথায় গেল, সে কথা কেউ বলতে পারে না।

বনের পাখীকে সোনার খাঁচায় বন্দী ক'রে কেউ ভেব না, তার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছো। তোমরা যাকে মনে কর পাখীর আনন্দের গান, সে হচ্ছে পাখীর দারুণ অভিশাপ।

বিখ্যাত চোরের অ্যাডভেঞ্চার

এক বিশ্ববিখ্যাত চোরের সত্যিকার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী!

কিছু-কম চারশো বছর আগে বিলাতে এই চোরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু আজ সারা পৃথিবীর সব দেশই তাকে ঘরের লোকের মতন আদর করে। কেবল আদর নয়, শ্রদ্ধাও করে। আর কোন চোরই পৃথিবীর কাছ থেকে এত সম্মান, এত ভালোবাসা পায় নি। এই সব-চেয়ে বিখ্যাত চোরের নাম তোমাদেরও অজানা নয়। গল্প শুনতে শুনতে তার নামটি আন্দাজ কর দেখি!

বিলাতের ওয়ারউইক্‌সায়ার ব'লে একটি জেলা আছে। তার শুক্‌নো বুক ভিজিয়ে বয়ে যায় সুন্দরী অ্যাভন নদী। তারই তীরে চার্লেকোট্‌ নামে এক তালুক। জমিদারের নাম স্যর টমাস লুসি।

মস্ত-বড় তালুক—তার মধ্যে গ্রামও আছে, বনও আছে। বনে দিকে দিকে চ'রে বেড়ায় হরিণের দল। এ-সব হরিণ স্তর টমাসের নিজের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য। কেউ হরিণ চুরি করলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। হরিণদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে অনেক লোক নিযুক্ত আছে। তবু আজকাল প্রায়ই হরিণের পর হরিণ চুরি যাচ্ছে।

কাজেই স্তর টমাস ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। দেওয়ানকে ডেকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, "ব্যাপারখানা কি বল দেখি? ফি হপ্তায় দেখছি আমার জমিদারি থেকে হরিণ চুরি যাচ্ছে। চোরেরা বাছা বাছা হরিণ নিয়ে পালায়! এ চুরি বন্ধ করতেই হবে!" চারি-দিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা কর! আমার বিশ্বাস, এ-সব এক-আধজন চোরের কীর্ত্তি নয়, এর মধ্যে অনেক লোক আছে!"

দেওয়ান ভয়ে ভয়ে বললে, "হুজুর, চারিদিকেই আমি পাহারা বসিয়েছি। এতদিন পরে কালকে একদল চোর প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে! সেপাইরা তাদের পিছনে তাড়া করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কারুকেই ধরতে পারে নি!"

স্তর টমাস জিজ্ঞাসা করলেন, "কারুর ওপরে কি তোমার সন্দেহ হয় না?"

দেওয়ান বললে, "গাঁয়ে গিয়ে আমি খোঁজ নিয়েছি। কতকগুলো ছোকরাকে দেখলুম, তারা আপনার নামে যা-খুসি-তাই ব'লে বেড়ায়! হরিণ-চুরির কথা তুললে তারা আবার মুখ টিপে টিপে হাসে। কিন্তু তাদের মধ্যে কে চোর আর কে সাধু, সে কথা বলা ভারি শক্ত।"

স্যর টমাস মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, "একবার যদি হতভাগাদের ধরতে পারি, তাহ'লে তাদের কেউ আর মুখ টিপে টিপে হাসবে না! বার বার চুরি! দেওয়ান, এ চুরি বন্ধ করতেই হবে!"

হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল—বাদ-প্রতিবাদ, ধস্তাধস্তি! তারপরেই একজন লোক ঘরের ভিতরে ঢুকে সেলাম ক'রে বললে, "হুজুর, কাল রাত্রে একটা চোর ধরা পড়েছে!"

স্যর টমাস অত্যন্ত আগ্রহে ব'লে উঠলেন, "কোথায় সে বদমাইস?"

—"অনেক কষ্টে তাকে ধরে এনে কাছারি-বাড়ীর একটা ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে।"

—"তাকে তুমি চেনো?"

—"না হুজুর! কিন্তু গাঁয়ের সবাই তাকে চেনে। হাড়বখাটে ছোকরা, আরো দু'একবার নাকি অন্যায় কাজ ক'রে ধরা পড়েছে।"

—"কেমন ক'রে তাকে ধরলে?"

—"হরিণটাকে মেরে কাঁধে তুলে সে বনের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছিল। সেই সময়ে দেখতে পেয়ে আমাদের লোকেরা তাকে তাড়া করে। তখন যদি হরিণটাকে ফেলে দিয়ে সে পালাতো, তা' হ'লে কেউ তাকে ধরতে পারত না।"

বিকট আনন্দে স্যর টমাস বললেন, "নিয়ে এস—এখনি তাকে এখানে নিয়ে এস, পরদ্রব্য চুরি করার মজাটা সে ভোগ করুক্! দেওয়ান, তুমি এখন যেতে পারো। কিন্তু সাবধান! মনে রেখো, আরো অনেক চোর আমার বনে বেড়াতে আসে, একে একে তাদের সবাইকেই ধ'রে দশ ঘাটের জল খাওয়াতে হবে!"

স্তর টমাস কেবল জমিদার নয়। তিনি পার্লামেন্টের সভ্য, আদালতের বিচারক। কাজেই তাড়াতাড়ি নিজের পদ-মর্য্যাদার উপযোগী জমকালো পোষাক প'রে নিলেন। তারপর খুব ভারিক্কে চালে পা ফেলে, মুখখানা প্যাঁচার মত গম্ভীর ক'রে তুলে প্রকাণ্ড হল-ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। এইখানে ব'সেই তিনি জমিদারির কারুকর্ম্ম করেন, প্রজাদের আবেদন নিবেদন শোনেন, দোষীদের শাস্তি দেন। হরিণ-চোর ধরা পড়েছে শুনে স্তর টমাসের পরিবারের অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষরাও মজা দেখবার জন্যে সেখানে এসে জুটলেন।

শোনা গেল, দূর থেকে একটা গোলমাল ক্রমেই বাড়ীর কাছে এগিয়ে আসছে। তারপর অনেক লোকের পায়ের শব্দ হল-ঘরের দরজার সামনে এসে থামল। তারপর দুজন পাহারাওয়ালা দুদিক থেকে এক নবীন যুবককে ধ'রে টানতে টানতে ঘরের ভিতর এনে হাজির করলে। তার পিছনে আর একজন লোকের কাঁধে একটা দিব্য মোটাসোটা মরা হরিণ। আর-একজন লোকের হাতে রয়েছে একটা ধনুক—এই ধনুকেই বাণ জুড়ে চোর হরিণটাকে বধ করেছে। সব-পিছনে আরো একদল লোক, তারাও এসেছে মজা দেখতে। পৃথিবীতে চিরদিনই চোরের শাস্তি দেখা, ভারি একটা মজার ব্যাপার।

চোরের বয়স কুড়ি বছরের মধ্যেই। দেখতে সুপুরুষ, মাথায় ঢেউ খেলানো লম্বা চুল, ডাগর ডাগর চোখ, মুখে কচি গোঁফ-দাড়ির রেখা, মাঝারি আঁকার। তাকে দেখলে কেউ চোর ব'লে সন্দেহ করতে পারবে না।

কড়া চালে চড়া স্বরে স্যর টমাস বললেন, "এদিকে এগিয়ে এস ছোকরা!"

চোর এগিয়ে এল।

—"কি নাম তোমার?"

চোর নিজের নাম বললে।

নাম শুনে স্যর টমাসের কিছুমাত্র ভাব-পরিবর্ত্তন হ'ল না। তখন সে নামের কোনই মূল্য ছিল না, যদিও আজ সে নাম শুনলে বিশ্বের মাথা নত হয়।

দুই চোখ পাকিয়ে স্যর টমাস বললেন, "তোমার নামে চুরির অভিযোগ হয়েছে। তোমার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের সন্দেহ করবার কোন উপায় নেই। তুমি বামাল সমেত ধরা পড়েছ। তোমার অপরাধ গুরুতর। কাজেই তোমার দণ্ডও লঘু হবে না। এ-অঞ্চলে তোমার মতন আরো কয়েকজন পাজী চোর-ছ্যাঁচোড় আছে ব'লে খবর পেয়েছি। তাই তোমাকে আমি এমন শাস্তি দিতে চাই, যাতে সবাই সময় থাকতে সাবধান হয়।"

চোর মৃদু স্বরে বললে, "বেশ, আমি জরিমানা দেব।"

স্যর টমাস কঠোর কণ্ঠে বললেন, "না!"

—"তাহ'লে আমাকে জেলে পাঠান।"

স্যর টমাস কঠোর কণ্ঠে বললেন, "না, না! তোমার জরিমানাও হবে না, তোমাকে জেলেও পাঠাব না! তোমার পৃষ্ঠে ত্রিশবার বেত্রাঘাত করা হবে!"

বেত্রাঘাত ছিল তখন অত্যন্ত অপমানকর দণ্ড। আসামীর মুখ

রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। এমন দণ্ডের কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি, তাড়াতাড়ি আর্ত্ত স্বরে সে ব'লে উঠল, "জরিমানা করুন—জেলে পাঠান, কিন্তু দয়া ক'রে বেত-মারার হুকুম দেবেন না!"

স্যর টমাস অটল ভাবে বললেন, "আসামীকে নিয়ে যাও এখান থেকে! তার পিঠে সপাসপ্ ত্রিশ ঘা বেত মারা হোক্!"

• চোরকে সবাই টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর তাকে সকলকার সামনে এক প্রকাশ্য স্থানে দাঁড় করিয়ে তার দুই হাত বেঁধে পিঠে বেতের পর বেত মারা হ'ল।

সেদিন রক্তাক্ত দেহে মাথা নীচু ক'রে চোর যখন বাড়ীতে ফিরে এল, তখন পিঠের যাতনার চেয়ে মনের যাতনাই তাকে বেশী কাবু ক'রে ফেলেছে। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তার সারা প্রাণ ছট্‌ফট্ করতে লাগল, কিন্তু মহাধনী মহা শক্তিশালী জমিদার স্যর টমাস লুসির বিরুদ্ধে কী প্রতিহিংসা সে নিতে পারে? তার সহায়ও নেই, সম্পদও নেই! আবার কি সে বনে ঢুকে হরিণ চুরি করবে? না, চারিদিকে সতর্ক পাহারা, এবারে ধরা পড়লে অপমানের আর অন্ত থাকবে না!

কিন্তু প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—যেমন ক'রে হোক্ প্রতিশোধ নিতেই হবে—ধনী স্যর টমাসকে বুঝিয়ে দিতেই হবে, গরিবও প্রতিশোধ নিতে পারে। চোর ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। হঠাৎ ছেলেবেলার ইস্কুলের কথা তার মনে পড়ল। ছেলেরা এক দুষ্ট মাষ্টারের নামে পদ্য লিখে তাঁকে প্রায় পাগল ক'রে ছেড়েছিল। হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেবার এই একটা সহজ

উপায় আছে বটে। কিন্তু সে তো জীবনে কখনো পদ্য লেখেনি। সে তো পদ্য লিখতে জানে না। আচ্ছা, একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ?

চোর কাগজ নিলে, কলম নিলে এবং একমনে স্যর টমাসের নামে পদ্য লিখতে বসল। লিখতে লিখতে সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করলে যে, তার পক্ষে পদ্য লেখা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। শেষ পর্য্যন্ত কবিতাটি যা দাঁড়াল, তা পাঠ করলে স্যর টমাস যে আহ্লাদে আটখানা হবেন না, এটুকু বুঝে চোরের মন অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হ'ল। সমস্ত পদ্যটি এখানে তুলে দেবার সময় নেই, মাত্র কয়েকটি লাইনের নমুনা দেখলেই তোমরা তার কতকটা পরিচয় পাবে।

"পার্লামেণ্টের সভ্য সে যে,
আদালতের জজ সে হাঁদা,
ঘরের ভেতর জুজুবুড়ো,
বাইরে তাকে দেখায় গাধা।
কাণ ধ'রে তার নিয়ে গিয়ে
গাধীর সঙ্গে দাও-গে বিয়ে—"
প্রভৃতি।

আমাদের কবি তখনি তার এই অপূর্ব্ব রচনাটি নিয়ে দৌড়ে গাঁয়ের সঙ্গীদের কাছে হাজির হ'ল এবং সকলকে আগ্রহ-ভরে প'ড়ে শোনালে। কবিতাটি তাদের এত চমৎকার লাগল যে, তখনি তারা মুখস্থ ক'রে ফেললে। তাদের মধ্যে ছিল একজন গাইয়ে, সে আবার সুর দিয়ে কবিতাটিকে গানের মতন গাইতে আরম্ভ করলে। দুদিন

যেতে-না-যেতেই সারা গাঁয়ের লোক মনের আনন্দে উচ্চস্বরে কবিতাটি আওড়াতে বা গাইতে সুরু ক'রে দিলে। সে-অঞ্চলে স্যর টমাসকে কেউ পছন্দ করত না।

কিন্তু এতেও নবীন কবির মনের সাধ মিটল না। কারণ স্যর টমাস হয়তো স্বকর্ণে এমন মুল্যবান্ কবিতাটি শ্রবণ করেন নি। অতএব সে এক রাত্রে চুপি চুপি গিয়ে জমিদার-বাড়ীর ফটকের গায়ে কবিতাটি লট্‌কে দিয়ে এল।

পরদিন সকালে ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে স্যর টমাস খেতে বসেছেন, এমন সময়ে এক চাকর সেই কবিতার কাগজখানা নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লে, "হুজুর, এখানা ফটকে ঝুলছিল। আমরা পড়তে জানিনা, দেখুন তো দরকারী কাগজ কিনা?"

স্যর টমাস কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়েই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললেন, "হতভাগা, নিশ্চয়ই তুই পড়তে জানিস্। কাগজ-খানা প'ড়েই আমাকে দেখাতে এসেছিস্। দূর হ, বেরো এখান থেকে। চাবুকে তোর বিষ ঝেড়ে দেব, জানিস্?"

চাকর তো এক ছুটে পালিয়ে বাঁচল,—সত্যিই সে লেখাপড়া জানত না।

স্যর টমাস একটু ভেবেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুঝেছি, এ সেই পাজীর-পা-ঝাড়া চোরের কাণ্ড! আমি তার কাণ কেটে নেব—আমি তার কাণ কেটে নেব!"

চোর-কবির কাণ অবশ্য কাটা যায় নি, কিন্তু স্যর টমাসের অত্যাচারে তাকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হ'ল। তবে অনেক বছর

পরে আবার যখন গ্রামে ফিরে এল, তখন সে একজন দেশ-বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার।

স্যর টমাস কবে মারা গিয়েছেন। আজ তাঁকে কেউ চিনত না। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার তাঁকে নিয়ে প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন ব'লেই লোকে আজও তাঁর নাম ভোলে নি। চারশো বছর আগেকার সেই হরিণ-চোরের নাম কি তোমরা শুনতে চাও? তিনি উইলিয়ম সেক্সপিয়ার।

টেলিফোনে গোয়েন্দাগিরি

ক

যে-গল্পটি বলতে বসেছি তা গল্প বটে, কিন্তু একেবারে সত্য ঘটনা। কবি সেক্সপিয়ার বলেছেন, 'সত্য হচ্ছে উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য্য'। অন্ততঃ এ-ঘটনাটি সত্য হ'লেও এমন আশ্চর্য্য যে, বিখ্যাত বিলাতী লেখক কন্যান্ ডইল সাহেব একে অবলম্বন ক'রেই শার্লক্ হোম্‌সের একটি গল্প লিখে ফেলেছেন। আমি কিন্তু শার্লক হোম্‌সের গল্প তোমাদের শোনাব না, আমি যা বলব তা হচ্ছে অষ্ট্রিয়া দেশের সত্যিকার পুলিসের কাহিনী, এর প্রত্যেকটি কথা পুলিসের নিজস্ব দপ্তরে লেখা আছে।

অষ্ট্রিয়ার পুলিস চোর ডাকাত হত্যাকারী ধরবার জন্যে অনেক সময়ে এক নতুন উপায় অবলম্বন করে। ঘটনাস্থলে যে-সব জিনিষ পাওয়া যায়, পুলিস সেগুলো দেয় রাসায়নিক পণ্ডিতদের হাতে। তাঁদের পরীক্ষার ফলে অপরাধীরা প্রায়ই বিচিত্র উপায়ে ধরা পড়ে। সে-পরীক্ষার পদ্ধতি কি-রকম, নীচের ঘটনা থেকে কতকটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, রসায়ন-শাস্ত্রের দুজন অধ্যাপক ঘটনাস্থল থেকে তিনশো ষাট মাইল দূরে অবস্থান ক'রেও এবং ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত কোন জিনিষ চোখে না দেখেও আসল অপরাধী ধ'রে ফেলে পুলিসের চক্ষু স্থির ক'রে দিয়েছিলেন! অপরাধের ইতিহাসে, এমন-কি কাল্পনিক গোয়েন্দা-কাহিনীতেও এ-রকম ঘটনার কথা কেউ কখনো শোনে নি।

ভিয়েনা হচ্ছে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী। ভিয়েনা সহরের পা ধুয়ে বয়ে যায় ডানিউব নদী। তার উপরে আছে কয়েকটি সাঁকো। একদিন খুব ভোর বেলায় সাঁকোর পিল্লাদার রেলিংয়ের তলায় পাওয়া গেল একটি মৃতদেহ!

দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দেহ। জম্‌কালো দামী পোষাক পরা। বয়সে লোকটি প্রাচীন। দেহের খানিক তফাতে পাওয়া গেল রিভলভার, খুব সম্ভব হত্যাকারী তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে ফেলে গিয়েছে। দেহে গুলির দাগ আছে। মৃতের পকেট একেবারে খালি।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, মৃত ব্যক্তির নাম হান্স্‌ ভোগেল, লোহার ব্যবসায়ে কোটিপতি। নিমন্ত্রণ খেয়ে শেষ-রাতে ফিরছিলেন, পথেই এই কাণ্ড। আরো প্রকাশ পেলে, তাঁর পকেটে অনেক টাকা ছিল।

পুলিশ স্থির করলে, অর্থলোভে কেউ ভোগেলকে হত্যা করেছে

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! সে যে কে, তা জানা গেল না; কারণ হত্যাকারী কোন সূত্র রেখে যায় নি।

পুলিস এ মামলা নিয়ে হয়তো বেশী মাথা ঘামাতো না, কিন্তু ঘামাতে বাধ্য হ'ল। এক জীবন-বীমা-কোম্পানীর অধ্যক্ষ এসে পুলিসের বড়-সাহেবকে জানালে, "ভোগেল আমাদের কোম্পানীতে তিন লক্ষ টাকার জীবন বীমা করেছেন। দুষ্ট লোকেরা আমাদের বড় বড় মক্কেলকে যদি এই ভাবে খুন ক'রে পার পায়, তাহ'লে বেশী ক্ষতি হয় আমাদেরই। অতএব খুনীকে ধরা চাই, আর যে ধরতে পারবে তাকে আমরা তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

পুরস্কার বড় সামান্য নয়। হত্যাকারীকে ধরবার জন্যে পুলিসের বড়-সাহেব উঠে-পড়ে লাগলেন।

খ

বড়-সাহেব নিজে হালে পানি না পেয়ে বিখ্যাত রাসায়নিক প্রফেসর 'এক্স্'-এর খোঁজে বেরুলেন।

কিন্তু প্রফেসর 'এক্স্' তখন ভিয়েনা সহর থেকে তিনশো ষাট মাইল দূরে টাইরলে গেছেন বায়ু-পরিবর্ত্তনে।

বড়-সাহেব তাঁকে ফোন্ করলেন।

প্রফেসর আগাগোড়া সব শুনে বললেন, "ডাক্তারের মানা আছে, আমার পক্ষে এখন ভিয়েনায় ফেরা অসম্ভব!"

বড়-সাহেব এত সহজে ছোড়্নেওয়ালা নন। বললেন, "আচ্ছা প্রফেসর, ফোনের সাহায্যেই তাহ'লে কাজ চালানো যাক্। আপনি

যা বলবেন, আমি তা পালন করব। বলুন, আমায় কি করতে হবে? যদি কোন দরকারী তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন, তাহ'লে তিন হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা!"

প্রফেসর বললেন, "বহুৎ-আচ্ছা, ইজি-চেয়ারে এই আমি খুব আরাম ক'রে গদীয়ান্ হ'য়ে বসলুম। আমার সামনে আছে তামাকের পাইপ, খবরের কাগজ, পেন্সিল আর টেলিফোন। বেশ, তাহ'লে কাজ সুরু করা যাক্।.........আচ্ছা, একজন 'কেমিষ্ট'কে ডাকুন, আমার এই-সব 'কেমিকেল' দরকার।" তিনি 'কেমিকেলে'র ফর্দ্দ দিলেন।

ভিয়েনায় পুলিসের আফিসে 'কেমিস্ট'কে আনবার জন্যে খবর পাঠানো হ'ল।

টাইরল থেকে ফোনে প্রফেসর বললেন, "বড়-সাহেব, ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে যে রিভলভারটা পেয়েছেন, তার নল্‌চেটা (barrel) খুলে ফেলুন। নল্‌চের দুটো মুখই ছিপি এঁটে এমন ভাবে বন্ধ করে দিন, ভিতরে যাতে ধূলো-হাওয়া ঢুকতে না পারে।"

বড়-সাহেব খানিক পরে জবাব দিলেন, "প্রফেসর, আপনার কথামত কাজ করা হয়েছে। 'কেমিস্ট'ও এসেছেন।"

টেলিফোনে 'কেমিষ্ট'কে ডেকে প্রফেসর বললেন, "আমি যা বলি তাই করুন। রিভলভারের নল্‌চের ছিপি দুটো খুলে ফেলুন। হয়েছে? আচ্ছা, খানিকটা distilled জল নল্‌চের ভিতরে পূরে বেশ করে নাড়াচাড়া করুন। হয়েছে? আচ্ছা, এইবার নল্‌চের জলটুকু filter ক'রে নিন।.........আচ্ছা, এইবারে নল্‌চের জলে

sulphuric acid, alkaline sulphides আর salts of ironএর খোঁজ করুন। পরীক্ষার ফল কি হ'ল? নল্‌চের ভিতর থেকে মর্চে, কি green crystals of ferrous sulphate পাওয়া গেল?"

—"না।"

—"যে জলটা বেরুলো তার রং কি হাল্‌কা হল্‌দে নয়?"

—"না মশাই!"

—"সে কি, এ তো বড় অদ্ভুত কথা! আচ্ছা, ও-জলে কি sulphuretted hydrogenএর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে?"

—"না।"

—"তাই তো, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! বেশ, জলের সঙ্গে salts of lead মিশিয়ে দিন তো!·········কি হ'ল? কালো তলানি দেখতে পাচ্ছেন?"

—"উঁহু!"

—"কী!"······বিশেষজ্ঞ প্রফেসরের কাছ থেকে খানিকক্ষণ কোন জবাবই এল না। তারপর তাঁর গলা আবার পাওয়া গেল: "শুনুন! এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিশ্চয় কোন গভীর রহস্য আছে! নল্‌চের জলের ভিতরে sulphuric acid পেলে প্রমাণিত হ'ত যে, ঐ রিভলভার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে ছোঁড়া হয়েছে। কিন্তু তা যখন পাওয়া যায় নি তখন বুঝতে হবে যে, রিভলভারটা ছোঁড়া হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার আগেই। কিন্তু তা হ'তে পারে না, কারণ তাহ'লে অমন প্রকাশ্য সাঁকোর উপরে মৃতদেহটা ঘটনার আগের দিন সকালেই পাওয়া যেত! আচ্ছা, জলে বোধ হয় oxide of iron আছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে !"

—"বেশ। পুলিসের বড়-সাহেবকে ফোন্ ধরতে বলুন।"

বড়-সাহেব ফোন্ ধ'রে বললেন, "প্রফেসর, এ-সব কী শুনছি ? ও রিভলভারটা পাওয়া গেছে লাসের ঠিক পাশেই, আর তা-থেকে যে একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে, সে-প্রমাণও রয়েছে !"

—"হ'তে পারে। কিন্তু ও-রিভলভারটা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়, কারণ ওটা ছোঁড়া হয়েছে ঘটনার দেড়দিন থেকে পাঁচদিন আগে !"

—"তাহ'লে আমাদের ঠকাবার জন্যেই হত্যাকারী ওটা ওখানে ফেলে গেছে।"

—"আচ্ছা, আরেকটু পরখ করা যাক্। আচ্ছা, মৃতব্যক্তির দেহের ভিতর থেকে গুলি পাওয়া গেছে ?"

—"হ্যাঁ, সেটা আমার টেবিলের উপরেই রয়েছে।"

—"গুলিটা পরীক্ষা করেছেন ?"

—"এখনো করি নি।"

—"বেশ, এখন পরীক্ষা ক'রে দেখুন দেখি, গুলিটার মাপ কত ?"

······খানিক পরেই বড়-সাহেব অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "প্রফেসর, প্রফেসর ! আপনি যা বলেছেন, তাই ! ও গুলিটা এ রিভলভারের ব্যাসের চেয়ে বড় ! ওটা অন্য কোন রিভলভারের গুলি !"—

বড়-সাহেব প্রায় হতভম্ব ! চোর-ডাকাত-খুনে ধরা তাঁর ব্যবসায়, ঘটনাস্থল তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, সমস্ত প্রমাণ তাঁরই হাতে রয়েছে এবং শত শত গোয়েন্দা তাঁকে সাহায্য করছে, অথচ একজন প্রফেসর

সকলকার সামনে তার দুই হাত পরে পিঠে ব তরপর বত মারা হ ল

—৬১ পৃষ্ঠ

সাড়ে তিনশো মাইল দূরে ব'সে কোন-কিছু চোখে না দেখে এবং হাতে-নাতে পরীক্ষা না ক'রে অনায়াসেই রহস্যটা ধ'রে ফেললেন! তাঁর আত্মসম্মানে বোধহয় অত্যন্ত আঘাত লাগল।

প্রফেসর 'এক্স্' বললেন, "বড়-সাহেব, বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ-তত্ত্বের সহকারী প্রফেসর 'ওয়াই' সম্প্রতি আমার এখানে আছেন। এইবারে আপনি ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।···হ্যাঁ, আর এক জিজ্ঞাসা। মৃত ব্যক্তির জামাটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে? দেখুন তো, জামায় যেখানে গুলি ঢুকেছে, সেখানে পোড়া বারুদের দাগ আছে কিনা?"

—"আছে।"

—"হুঁ। তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে, মৃতের দেহের খুব কাছ থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে। আচ্ছা, প্রফেসর 'ওয়াই' কথা বলছেন।"

প্রফেসর 'ওয়াই' ফোন ধ'রে বললেন, "নমস্কার বড়-সাহেব। ভোগেলের মৃতদেহ থেকে আপনি কি কি জিনিষ পেয়েছেন, আর কি কি হারিয়েছে?"

প্রাপ্ত জিনিষের ফর্দ্দ দিয়ে বড-সাহেব বললেন, "কিন্তু ভোগেলের পকেটে তিনখানা গভর্ণ্মেণ্টের প্রমিসরি নোট ছিল, তা পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"বড়-সাহেব, আসল ব্যাপার আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু সেটা এখন আপনাকে বলতে পারব না। ঐ প্রমিসরি নোটগুলোর নম্বর আপনার কাছে আছে তো?

—"আছে।"

—"সরকারি ব্যাঙ্কের নামে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, যে ব্যক্তি ঐ নোটগুলো ফেরৎ দেবে, সে ওদের বর্ত্তমান দামের চেয়ে বেশী মূল্য পাবে!"

বড়-সাহেব বললেন, "প্রফেসর, আপনি কি খুনীকে এতই বোকা ভাবেন যে, সে এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে ধরা দিয়ে আত্মহত্যা করবে?"

—"একবার বিজ্ঞাপন দিয়েই দেখুন না! আমাদের বিশ্বাস, অপরাধী নিজে না এসে অর্থলোভে অন্য কোন লোককে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবে।"

৭

পরদিনেই প্রফেসরদের ঘরে পুলিসের বড়-সাহেব ফোনের ঘণ্টা বাজিয়ে বললেন, "আশ্চর্য্য প্রফেসর, আশ্চর্য্য ব্যাপার! আপনারা যা বলেছিলেন ঠিক তাই হয়েছে! একজন লোক সেই নোটগুলো নিয়ে সত্যি-সত্যিই ব্যাঙ্কে এসেছিল! তাকে যে পাঠিয়েছিল আমরা সে-ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছি!"

—"সে কি বলে?"

—"সে ভয়ে দিশেহারা হয়ে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে! বলে, ভোগেল নিমন্ত্রণ খেয়ে মাতাল হয়ে ফেরবার পথে এক জায়গায় ব'সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে সে তার পকেট কেটে নোট নিয়ে পালিয়ে এসেছে!"

—"আপনার কি মনে হয়?"

—"প্রফেসর, আমার বিশ্বাস সে খুন করেনি। যারা মানুষ খুন করে তাদের চেহারা, ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা অন্যরকম হয়। আপাতত তাকে আমি গারদে পুরে রেখেছি।"

—"বেশ করেছেন। কারণ সে যে ভোগেলের পকেট কেটেছে, তাতে তো আর সন্দেহ নেই!·········বড়-সাহেব, এক কাজ করতে পারবেন ?"

—"কি কাজ ?"

—"সাঁকোর উপরে যেখানে ভোগেলের লাস পাওয়া গেছে, একবার সেইখানে যান। সাঁকোর ধারে যে লোহার রেলিং পাবেন, তার নীচে—মনে রাখবেন ভিতরদিকে—লোহার গায়ে কোন চটা-ওঠা দাগ আছে কিনা দেখে আসুন।"

প্রফেসরের অদ্ভুত অনুরোধ শুনে পুলিস-সাহেব রীতিমত অবাক্ হয়ে গেলেন। রেলিংয়ের গায়ে দাগই বা থাকবে কেন, আর থাকলেও তার সঙ্গে এই খুনের সম্পর্ক কি ?

······খানিকক্ষণ পরে টেলিফোনে আবার পুলিস-সাহেবের বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ "হেলো প্রফেসর! আমি দেখতে গিয়েছিলুম! হ্যাঁ, নীচের রেলিংয়ের ভিতরদিকের রং এক-জায়গায় চ'টে গেছে বটে! নতুন দাগ! যেন সেখানে কোন-একটা ভারি জিনিষ গিয়ে প'ড়েছিল! কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কি ক'রে? কেউ কি আপনাকে বলেছে ?"

সশব্দে হাস্য ক'রে খুসি গলায় প্রফেসর বললেন, "না! আমরা দুই প্রফেসরে মাথা খাটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। আমরা

যে গল্পটি তৈরি করেছি সেটা সত্য কি না, আপনারা খোঁজ নিলেই
ব্যক্তি বুঝতে পারবেন। এই হচ্ছে আমাদের গল্প ঃ
বেশী

দ

ভাবে "ভোগেলের ব্যবসায়ে আজকাল খুব লোকসান হচ্ছিল, আর দুদিন
করে পরেই হয়তো তাকে দেউলে হ'তে হ'ত এবং তার পরিবারবর্গ পথে
বসত।

অপর চোখের সামনে স্ত্রী-পুত্রকন্যার দারিদ্র্যের ছবি দেখতে দেখতে
পাঠি ভোগেল প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠল। দিন-রাত ভাবতে লাগল,
এই দুর্ভাগ্যের দায় থেকে কি-উপায়ে সে পরিবারবর্গকে উদ্ধার
করবে?

প্রথমে সে তিন লক্ষ টাকায় নিজের জীবন বীমা করলে। কিন্তু
বাক্তি জীবন বীমার সর্ত্তে লেখা রইল, সে আত্মহত্যা করলে জীবন-বীমা-
যা ব কোম্পানী তার পরিবারবর্গকে টাকা দিতে বাধ্য থাকবে না। এ সর্ত্ত
নিম্নো থাকলে ভোগেলের খুবই সুবিধা হ'ত। কারণ সে স্থির করেছিল,
সে-ব এই উপায়েই পরিবারবর্গকে রক্ষা করবে!

প্রথমে সে একটি রিভলভারে ছয়টি গুলি পূরে একটি গুলি ছুঁড়লে।
সেই রিভলভারের সঙ্গে আর-একটা গুলিভরা রিভলভার পকেটে পূরে
বলে ভোগেল নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গেল।

ব'সে অনেক রাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে সে পথে বেরুলো। দেখলে একটা
পাহারাদারের মতন লোক তার পিছু নিয়েছে। তখন তার মাথায় আর
এক বুদ্ধি জুটল। সে মাতলামির অভিনয় করতে করতে এক জায়গায়

ব'সে প'ড়ে ঘুমের ভাণ করলে! চোর তার পকেট কাটলে, কিন্তু সজ্ঞানেও সে বাধা দিলে না!

তারপর ভোগেল উঠে সাঁকোর উপরে গেল। প্রথম রিভলভারটা বার ক'রে একটু তফাতে ফেলে দিলে। লোকে ভাববে, তাকে খুন ক'রে পালাবার সময়ে খুনী ঐ রিভলভারটা ফেলে গেছে। রিভলভারটা তার কাছে থাকলে পাছে কেউ ভাবে যে, ওর দ্বারা সে-ই আত্মহত্যা করেছে, তাই সেটাকে ফেলে দিলে খানিক তফাতে। দ্বিতীয় রিভলভারটা বার ক'রে একগাছা শক্ত দড়ির একপ্রান্তে বেঁধে ফেললে। এবং দড়ির অন্য প্রান্তে বাঁধলে একটা খুব ভারি জিনিষ—খুব-সম্ভব মস্ত একখানা পাথর। তারপর পাথরখানা রেলিং গলিয়ে সাঁকোর বাইরে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর নিজের বুকে রিভলভার রেখে গুলি ছুঁড়লে।

হতভাগ্য ভোগেলের তখনি মৃত্যু হ'ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়ি-বাঁধা রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে সেই মস্ত-ভারি পাথরখানা ডানিউব নদীর ভিতরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে গলবার সময়ে ভারি পাথরের টানে রিভলভারটা খুব জোরে রেলিংয়ের উপরে গিয়ে পড়ল—লোহার গায়ে তাই চটা-ওঠা দাগ হয়ে গেল।

বড়-সাহেব, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই নাটকের দুরাত্মা ঐ পকেটমার বেচারা নয়, ভোগেল নিজেই! ডানিউব নদীতে ডুবুরী নামিয়ে খোঁজ করলেই দড়ির দুই প্রান্তে বাঁধা সেই রিভলভার ও পাথরখানা খুঁজে পাওয়া যাবে। ভোগেল ভেবেছিল, এত চালাকির পরেও তার মৃত্যুকে কেউ আত্মহত্যা ব'লে সন্দেহ করতে পারবে না.

জীবন-বীমা-কোম্পানী তার পরিবারবর্গকে তিন লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হবে এবং নম্বরী নোট ভাঙাতে গিয়ে তাকে হত্যা করবার অপরাধে ধরা পড়বে ঐ পকেট-কাটাই !

কিন্তু নিজের স্ত্রী-পুত্রকন্যার সুখের জন্যে সে আর এক অভাগাকে ফাঁসিকাঠে তুলে দিতে চেয়েছিল, আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েও তাই সে ভগবানের দয়া পেলে না।”

প্রফেসরদের অনুমান সব দিক দিয়েই সত্যে পরিণত হ'ল।
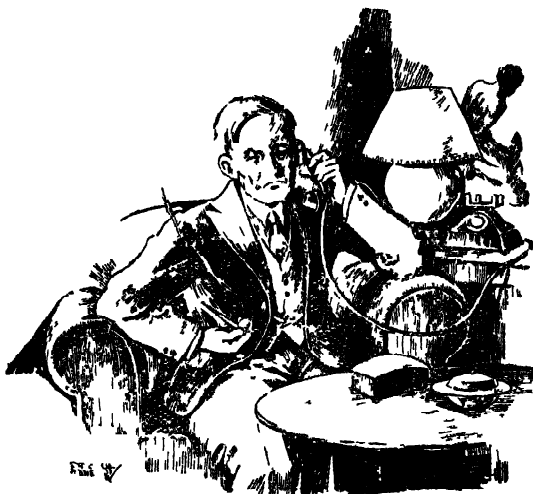
ডানিউব নদীর গর্ভ থেকে দড়ি-বাঁধা পাথর ও রিভলভার দুইই পাওয়া গেল।

জীবন-বীমা-কোম্পানী তিন লক্ষ টাকা লোকসানের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে, অঙ্গীকৃত তিন হাজার টাকার চেয়েও বেশী পুরস্কার দিয়ে প্রফেসরদের খুসি করলে।

এই ব্যাপারটি কি উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্য্য নয়? কখনো কোন উপন্যাসের ডিটেকটিভও কি ঐ দুই প্রফেসরের চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছে? কিন্তু তোমরা কেউ এই ব্যাপারটিকে অবিশ্বাস করো না, কারণ এটি হচ্ছে অষ্ট্রিয়া দেশের একটি বিখ্যাত সত্য ঘটনা!

প্যারীর বালক বিভীষিকা

এক

টেট্ ডি-ওর হচ্ছে এক গাঁট-কাটার ছেলে। তার মা সার্কাসে খেলা দেখাত। জাতে সে ফরাসী।

টেট্‌কে দেখতে ছিল ভারি সুন্দর। যেমন মুখ-চোখ, মাথায় তেমনি একরাশ সোনালী চুলের গোছা। তার মিষ্টি চেহারা দেখলেই লোকে আদর না ক'রে পারত না।

দিনরাত সার্কাসের খেলোয়াড়দের সঙ্গে থেকে সে খুব কম বয়সেই হরেকরকম কায়দা শিখে ফেললে। লম্বা বাঁশ বেয়ে

বানরের মত সড়্-সড়্ ক'রে উপরে উঠে যেতে পারত। কেউ ধরতে এলে তার পায়ের তলা দিয়ে ফস্ ক'রে গ'লে পালিয়ে যেতে পারত। কেউ হাতে চেপে ধরেও তাকে বন্দী করতে পারত না—সে মাছের মতন হাত থেকে পিছলে স'রে পড়ত। তারের খেলা, দড়ির খেলা, এ-সব কিছুই তার অজানা ছিল না। এই দুষ্টু খোকাটির দৌরাত্ম্যে সার্কাসের সমস্ত লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

একদিন টেটের গাঁটকাটা বাপ তাকে একটা টাকা দেখিয়ে বল্লে, "টাকা নিবি ?"

টেট্ খুসি হয়ে বললে,—"হুঁ, নেব বৈকি।"

—"এই নে তবে। কিন্তু দেখিস্, কেউ যেন কেড়ে নেয় না।"

টেট্ টাকাটা সাবধানে পকেটে রেখে বললে, "ইস্, কেড়ে নেবে বৈকি! আমি তেমন বাচ্চা নই।"

তার বাপ বললে, "তুই তো ভারি অসাবধানী দেখছি! টাকাটা এর মধ্যেই হারিয়ে ফেললি ?"

টেট্ মাথা নেড়ে বললে, "কথ্খনো না। টাকা আমার পকেটেই আছে।"

বাপ একটা টাকা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললে. "এই ছাখ তোর সেই টাকাটা।"

টেট্ তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলে,—পকেট ফোকা। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে সে হাঁ ক'রে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাপ বললে, "কেমন ক'রে তোর টাকাটা আমার হাতে এল, বুঝতে পারচিস্ না ? আয় তোকে প্যাঁচটা শিখিয়ে দিই!"

তারপর থেকে টেট্ সকলকার পকেট মারতে সুরু করলে—তার বাপ মাযের পকেটও বাদ গেল না। যে সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে সার্কাস দেখতে আসত, প্রাযই তাদেরও পকেট থেকে জিনিষ হারাতে লাগল।

টেটের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন এক অগ্নিকাণ্ডে তার মা আর বাপ পুড়ে মারা পড়ল। সার্কাসের লোকেরা তাকে এক অনাথ আশ্রমে ভর্ত্তি ক'রে দিলে। কিন্তু অনাথ আশ্রম তার ভাল লাগল না। কর্ত্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে টেট্ একদিন পালিযে গেল।

একখানা গাডীতে লুকিয়ে উঠে সে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী সহরে এসে হাজির হ'ল।

দুই

প্যারী সহরে এসেই টেট্, এক মেয়ে-দোকানীর টাকার ব্যাগ নিয়ে স'রে পড়ল।

সেই টাকায় নতুন জামা-কাপড় কিনে সে ভদ্রলোকের ছেলে সাজলে। তারপর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে এই আত্ম-পরিচয় দিলেঃ

"আমি এক মস্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোকের একমাত্র ছেলে। আমার মা নেই। আমার বাবা ভয়ানক মাতাল। মদ খেয়ে রোজ বিনা-দোষে মেরে আমার হাড় ভেঙ্গে দেন। সে অত্যাচার আর সইতে না পেরে আমি পালিয়ে এসেছি। আমার বাবা এক সাংঘাতিক অসুখে ভুগছেন,—তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না। তখন তাঁর

সমস্ত সম্পত্তির মালিক হব আমি। আপাততঃ আমাদের এক পুরাণো চাকর লুকিয়ে আমাকে টাকা পাঠাবে।”

স্ত্রীলোকটি বালক টেটের সুন্দর মুখ দেখে, তার সব কথায় বিশ্বাস ক'রে তাকে আশ্রয় দিলে।

টেট্ পুরাণো জামার দোকানে গিয়ে এমন একটা লম্বা জামা কিনলে, যা পরলে তার পা পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে। তারপর ব'সে ব'সে নিজের হাতে জামার ভিতর দিকে অনেকগুলো নতুন ও বড় বড় পকেট তৈরি করলে। জামার বাইরেকার দুই দিকে দুই পকেটে দুটো এমন লম্বা ছ্যাঁদা করলে, যাতে পকেটের ভিতর থেকে ইচ্ছা করলেই সে হাত বার করতে পারে!

এই অদ্ভুত জামা প'রে সে সহরের পথে পথে শিকার করতে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরেই পুলিসের কাছে খবর এল যে, সহরে গাঁটকাটার সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে! তখনি এদিকে চোখ রাখবার জন্যে একজন ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত হ'ল। তার নাম ডুবইস্।

ডুবইস্ খুব চালাক ডিটেক্‌টিভ। ভেবে চিন্তে সে পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকের বেশ ধ'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে পকেট থেকে ব্যাগ বার ক'রে খোলে—তার ভিতরে এক তাড়া নোট। ব্যাগটা আবার পকেটে রেখে দেয়। কিন্তু ব্যাগটা যে এক-গাছা সূতো দিয়ে পকেটে বাঁধা আছে, এ গুপ্তকথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না!

ডুবইস্ পথের এক জায়গায় ভিড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই তাঁর

পকেটে টান পড়ল। তৎক্ষণাৎ ফিরেই সে একটি ছোক্‌রাকে চেপে ধরলে। সে হচ্ছে টেট্। মাথার ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া লম্বা· চুলগুলো সে এমনভাবে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে যে, তার মুখ প্রায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে।

এক মুহূর্ত্তেই অদ্ভুত কৌশলে ডিটেক্‌টিভের হাত ছিনিয়ে টেট্ সূতো ছিঁড়ে ব্যাগ নিয়ে তীরের মত দৌড় মারলে। ডুবইস্‌ও তার পিছনে পিছনে ছুট্‌ল। একটি গলির মোড় ফিরেই টেট্ অদৃশ্য হ'ল।

সে চট্‌পট্ উপরকার জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একখানা চিরুণী বার ক'রে মাথার চুলগুলো অন্যরকমভাবে আঁচড়ে নিলে।

ডুবইস্ সেখানে এসে ছোক্‌রা গাঁটকাটার বদলে দেখলে, একটি ফিট্‌ফাট্ পোষাক-পরা ইস্কুলের ছেলে পাশের এক দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে।

ডুবইস্ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "হ্যাঁ খোকা, একটা লম্বা কোর্ত্তা-পরা ঝাঁক্‌ড়া-চুলো ছোক্‌রাকে এইদিক দিয়ে যেতে দেখেচ ?"

অত্যন্ত নির্দ্দোষের মত টেট্ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ঐদিকে দৌড মেরেছে !"

তার নির্দ্দেশ-মত ডুবইস্ অন্যদিকে ছুটল !

সূতোশুদ্ধ ব্যাগটা পরীক্ষা ক'রে টেট্ বুঝলে, এইবারে পুলিসের টনক নড়েছে। সেও সাবধান হ'ল।

টেট্ তার বয়সী অনেকগুলো ছেলের সঙ্গে ভাব করলে। তারপর তাদেরও হাতের কায়দা শেখাতে লাগল।

টেটের উপদেশে তারা প্রথমে আত্মীয়-স্বজনের পকেট মেরে হাত

পাকাতে আরম্ভ করলে। তারপর রাস্তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পকেট লুণ্ঠন। তারপর ভিড়ের ভিতরে গিয়ে তারা দাসদাসীদের পকেট পরীক্ষা করতে লাগল!

এইভাবে তাদের হাত যখন বেশ সাফ্ হয়ে উঠল, টেট্ তখন তাদের গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করলে।

•এই ছোক্‌রা-গাঁটকাটারা টেট্‌কে নিজেদের সর্দ্দার বলে মেনে নিলে। তাদের লাভের আধাআধি অংশ টেটের পাওনা হ'ত।

তিন

প্যারী সহরের চারিদিকে মহা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল—ছোক্‌রা গাঁটকাটাদের অত্যাচারে টাকা-পয়সা নিয়ে পথে বেরুনো দায় হয়ে উঠেছে! এমন পকেটমারের উপদ্রব সহরে আর কখনো হয় নি!

ডুবইস্ তখনো হাল ছাড়েনি। সে একজন স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করলে। সে পকেটে টাকা বাজাতে বাজাতে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তার পকেটের গায়ে যে অনেকগুলো বঁড়্শী লাগানো আছে, একথা জানত কেবল সে নিজে।

হঠাৎ এক জায়গায় তার পকেটে কে হাত দিলে—সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ! সে ফিরে দেখলে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোক্‌রা যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করছে!

.. ছোক্‌রা বল্‌লে, "উঃ! আপনার পকেটে আমার হাত আট্‌কে গেছে! উঃ!"

—"আমার পকেটে? কি আশ্চর্য্য! এস, এদিকে এস, হাত

খুলে দিচ্ছি।” আড়ালে ডুবইস্ অপেক্ষা করছিল। ছোক্‌রাকে দেখে সে বল্‌লে, “কি হে, তুমি হাতকড়ি প’রে থানায় যেতে চাও, না আমাকে নিয়ে তোমার আড্ডায় ফিরে যাবে ?”

ছোক্‌রা, ডুবইস্‌কে তাদের দলের সর্দ্দারের ঘর দেখিয়ে দিলে।

রাত্রে টেট্ নিজের ঘরে ফিরে এল। হঠাৎ এক পর্দ্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ডুবইস্ তার সোনালী চুলগুলো বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলে। তার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দুই পায়ে দড়ি বেঁধে তাকে মাটির উপরে শুইয়ে রাখলে। তারপর ঘরের চারিদিকে চোরাই মাল খুঁজতে লাগল।

ডুবইস্ অবাক হয়ে দেখলে, টেট্-ছোক্‌রার পড়াশুনায় মন আছে ! কারণ ঘরের দেওয়ালে তাকে তাকে অগুন্তি বই সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক বই পুস্তকের দোকান থেকে চুরি করা।

খানিক পরে একটা শব্দ শুনে ডুবইস্ ফিরে দেখলে যে, টেট্ জানলার ভিতর দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ছে !

ডুবইস্ বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল ! ঘরের এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো দেওয়ালে টেট্ পায়ের দড়ি ঘষে ছিঁড়ে ফেলেছে !

চার

কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক ছোক্‌রাই কিছুদিন পরে টেট্‌কে আবার ধরিয়ে দিলে।

আদালতে তার বিচার হ’ল। বিচারক গম্ভীর ভাবে বললেন,

"ছোক্‌রা, তোমাকে এক বৎসর জেল খাটতে হবে।" টেট্‌ অবহেলা-ভরে বললে, "এক বছর ? মোটে বারোটা মাস। ভারি তো।"

আচম্বিতে কাটগড়া থেকে সে একলাফে বিচারকের টেবিলের

উপরে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে বিস্মিত পাহারাওয়ালাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে বাইরে পালিয়ে গেল। তারপর অনেক কষ্টে আবার তাকে ধরা হ'ল। তার সাহস ও কৌশল দেখে সকলেরই চক্ষু স্থির!

তার কিছুকাল পরে আর একবার সে পালাবার চেষ্টা করলে—টেটের শেষ-চেষ্টা।

জেলখানার উঁচু ছাদে উঠে সে দেখলে, খানিক নীচে একটা কার্ণিশ রয়েছে, সেখানে পৌঁছতে পারলে পলায়নের অত্যন্ত সুবিধা।

টেট্ লাফ মারলে। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কার্ণিশে গিয়ে পৌঁছতে পারলে না। একেবারে মাটির উপরে গিয়ে প'ড়ে তার ঘাড় ভেঙে গেল।

মোটে বারো বছর বয়সে টেটের মৃত্যু হয়। ফরাসী পুলিসের মতে, আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে মানুষ খুন ক'রে তাকে ঘাতকের হাতেই মরতে হ'ত।

যত বুদ্ধি থাক্, যত সাহস থাক্, অসৎ পথের পরিণাম চিরদিনই ভয়াবহ। ভালো ছেলে হ'লে টেট্ আজ নিশ্চয়ই মস্ত লোক হতে পারত।

এক

সিনেমায় গিয়ে কিংবা বই প'ড়ে বিলাতের উদার ডাকাত রবিন্ হুডের সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয় চেনাশুনা হয়েছে। রবিন্ হুড্ ইংলণ্ডের সেরউড্ অরণ্যে বাস করত এবং ধনীদের টাকা লুটে গরীবদের বিলিয়ে দিত।

কিন্তু একালের আর একজন রবিন্ হুডের নাম এখনো পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। সেকালে সত্যই রবিন্ হুড্ বলে কেউ ছিল কি না, সে-সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। কিন্তু একালের এই রবিন্ হুডের সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নেই। সে সত্যিকার মানুষ।

তার আসল নাম হুগো ব্রিট্উইজার। সে অষ্ট্রিয়ার লোক এবং তার কার্য্যক্ষেত্র ভিয়েনা সহরে।

হুগো রীতিমত ভদ্র পরিবারের ছেলে। সে শিক্ষিত ও ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তার মাথা এত সাফ্ যে, নিজের যত্নে ও অধ্যবসায়ে সে আরো নানান্ বিদ্যায় পাকা হয়ে উঠেছিল।

তালা-চাবি, সিন্দুক, বাক্স ও গরাদে প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে যে-সব লোহা ও অন্যান্য ধাতু ব্যবহৃত হ'ত, তাদের শক্তির খুঁটিনাটি সমস্তই সে জানত। লোহা ও ইস্পাতের উপরে কোন্ অ্যাসিডের কতটা প্রভাব, রসায়ন-বিদ্যা শিখে তাও সে জেনে নিয়েছিল। অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চ্চ দিয়ে কেমন ক'রে ইস্পাতের দরজায় ছ্যাঁদা করতে হয়, তাও তার অজানা ছিল না।

সে নিজের হাতে নানারকম অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি করতে পারত। চোর-ডাকাত ধরবার জন্যে একালের পুলিস যে-সব বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে, সে সমস্তই ছিল তার নখ-দর্পণে। বিখ্যাত ডিটেক্-টিভদের সমস্ত চাতুরীর কাহিনীই সে প'ড়ে ফেলেছিল। সে রীতিমত ব্যায়াম করত। জুজুৎসু, কুস্তি ও বক্সিংয়ের সব প্যাঁচই খুব ভালো ক'রে শিখেছিল।

যখন তার সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল, তখন হঠাৎ একদিন সে বাড়ী থেকে একেবারে গা-ঢাকা দিলে। বাড়ীর লোকে জানলে, হুগো দেশ ছেড়ে আমেরিকায় গিয়েছে।

সে কিন্তু ভিয়েনা সহরেই লুকিয়ে রইল। ছোটলোকদের বস্তীর ভিতরে একখানা ঘর ভাড়া নিলে। দিন-রাত সেই ঘরে একলা ব'সে

লেখাপড়া করতে লাগল এবং দাড়ী-গোঁফ কামানো ছেড়ে দিলে। কিছুদিন পরে দাড়ী-গোঁফে তার মুখ এমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল, কোন চেনা লোকের পক্ষেও তাকে চেনা আর সহজ রইল না।

দুই

সেবার বড়দিনের মুখে অষ্ট্রিয়ায় এমন হাড়ভাঙা শীত পড়ল যে, তেমন শীত আর কেউ কখনো দেখেনি।

অষ্ট্রিয়া হচ্ছে শীতপ্রধান দেশ, সেখানে ঘরের ভিতরে কয়লার আগুন জ্বেলে না রাখলে ঠাণ্ডায় মারা পড়বার সম্ভাবনা হয়। তার উপরে আবার এই অতিরিক্ত শীত।

সুবিধা বুঝে ট্রাস্ট ব্যবসায়ীরা কয়লার দাম অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে। ধনীদের কোনই বালাই নেই, বেশী ঠাণ্ডায় বেশী কয়লা কিনে পোড়াবার শক্তি তাদের আছে। কিন্তু যত অসুবিধা হ'ল গরীব বেচারীদের। চড়া দামে কয়লা কেনবার সঙ্গতি নেই,—অথচ চারি-দিকে বরফ পড়ছে, দেহের রক্ত জমাট্ হয়ে যাচ্ছে! আগুন পোয়াতে না পেরে অনেকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু সে ঘুম আর এ-জীবনে ভাঙল না।

বড়দিন আসতে মাত্র দুদিন দেরি। শীতার্ত্ত এক সন্ধ্যায় ভিয়েনার এক বড় ব্যবসায়ী তার দোকান-ঘর বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় ফিট্‌ফাট্ পোযাক-পরা এক যুবক তার দোকানে এসে ঢুকল।

যুবক বললে, "আমি হচ্ছি কোন দয়ালু মস্ত ধনীর সেক্রেটারী।

আমার মনিব তাঁর নাম প্রকাশ করতে রাজি নন। তিনি এক হাজার গরীব পরিবারকে কয়লা দান করিতে চান। কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত কয়লা পাঠাতে হবে। যাদের কাছে পাঠাতে হবে আমি এখনি তাদের ঠিকানা দিচ্ছি। কিন্তু আজকেই এত কয়লা পাঠাতে পারবে কি ?"

ব্যবসায়ী বললে, "কেন পারব না ? কিন্তু এত কয়লার দাম যে অনেক হাজার টাকা !"

যুবক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নোটের তাড়া বের ক'রে বললে, "দাম নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

ব্যবসায়ী কয়লা পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। যুবক সমস্ত দাম চুকিয়ে দিয়ে চ'লে গেল !

রাত হয়েছে ব'লে ব্যবসায়ী নোটের তাড়া ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারলে না। লোহার সিন্দুকে নোটগুলো পূরে দোকান বন্ধ করলে। একদিনেই এই আশাতীত লাভে তার মুখে হাসি আর ধরে না।

সে রাত্রে ভিয়েনার এক হাজার দরিদ্র পরিবারের মধ্যেও হাসি-খুসির ধুম প'ড়ে গেল। দাতার দানে ঘরে ঘরে কয়লা পুড়ছে, শীতের চোটে প্রাণের ভয় আর নাই।

তিন

পরদিন প্রভাতে ব্যবসায়ীর মুখের হাসি শুকিয়ে গেল।

স্তম্ভিত চক্ষে সে দেখলে, তার লোহার সিন্দুক খোলা, কাল রাতে

পাওয়া সেই নোটের তাড়া তো নেইই, সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক টাকা অদৃশ্য হয়েছে! সে তখনি পুলিসে খবর দিতে ছুটল।

গোটা সহরে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। কাগজে কাগজে অজানা দাতার এই অদ্ভুত দান ও অজানা চোরের এই অদ্ভুত চুরির কাহিনী এবং লোকের মুখে মুখে কেবল তারই আলোচনা।

কে এই দাতা? কে এই চোর?

য়ুরোপে ভিয়েনার পুলিসের ভারি সুনাম! কিন্তু সে সুনামে আজ কোন ফল হ'ল না। এই বিস্ময়কর চোর এমন সুচতুর ও সাবধানী যে, ধরা পড়বার কোন সূত্রই পিছনে রেখে যায় নি!

দু-চারদিন যেতে-না-যেতেই উত্তেজনার উপরে আবার নূতন উত্তেজনা। ভিয়েনার শত শত খবরের কাগজে এই পত্রখানি বেরুলো:

> "ব্যবসায়ীর লোহার সিন্দুক থেকে আমি যা নিয়েছি, তা হচ্ছে আমার নিজের টাকা। ঐ নীচ ব্যবসায়ী এই শীতে অকারণে কয়লার দাম বাড়িয়ে গরীবদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাই তার এই শাস্তি।
>
> ব্যবসায়ীর বাকি যে টাকাগুলো নিয়েছি, তা হচ্ছে আমার পারিশ্রমিক। ইতি—
>
> রবিন্‌হুড্‌।"

বলা বাহুল্য, আসলে এই আধুনিক রবিন্‌হুড্‌ আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত হুগো ছাড়া আর কেউ নয়।

তারপরে প্রায়ই ভিয়েনা সহরে বড় বড় চুরির মহা ধুম প'ড়ে গেল! ধনীদের সুরক্ষিত অট্টালিকা, কৃপণের লোহার দরজা, দুর্ভেদ্য ইস্পাতের সিন্দুক, চোরের কাছে সমস্তই যেন নগণ্য হয়ে উঠল!

দেশব্যাপী অভিযোগে ও ক্রমাগত ছুটাছুটি ক'রে ভিয়েনার বিখ্যাত পুলিস বাহিনীও দস্তুরমত কাহিল হয়ে পড়ল। কোন চুরিতেই চোর সামান্য সূত্রও রেখে যায় নি। চোরেরা হঠাৎ এমন অসম্ভব চালাক হ'য়ে উঠল কেমন ক'রে?

কিছুকাল পরে পুলিস অনেক সন্ধান নিয়ে আবিষ্কার করলে যে, এক-একটা বড় চুরি হবার পরেই সহরের গরীব লোকরা অজানা দাতার কাছ থেকে বহু টাকা পুরস্কার পায়!

পুলিস মাথা ঘামিয়ে বুঝতে পারলে যে, এ-সব চুরি বহু চোরের কীর্ত্তি নয়, সব চুরির মূলেই আছে নিশ্চয় সেই অদ্ভুত রবিনহুড্!

কিন্তু এই আবিষ্কারেও কোন লাভ হ'ল না। কে এই রবিনহুড্? কোথায় সে থাকে?

চার

কিছুতেই যখন রবিনহুডের ঠিকানা পাওয়া গেল না, তখন তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে পুলিস এক নূতন উপায় অবলম্বন করলে।

নানান খবরের কাগজে এক হঠাৎ-ধনী মাংস-ব্যবসায়ীর কথা

প্রকাশিত হ'ল। তার টাকাকড়ি, হীরা-জহরতের নাকি অন্ত নেই। সে নাকি এখন মাংস-ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে সৌখীন ধনীর মত সহরে নবাবী করতে এসেছে।

নানা থিয়েটারে ও উৎসবের আসরে তাকে সপরিবারে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। তার বউ ও মেয়েদের গায়ে এত জড়োয়ার গয়না যে, চোখ যেন ঝল্‌সে যায়।

কিন্তু বাড়ীতে ফিরে তারা নাকি খুব সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। রাত দুপুরের আগেই তাদের বাড়ীর সব আলো নিবে যায়।

এক রাত্রে বাড়ীর সব আলো নিবে গেছে এবং সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

যে-ঘরে তাদের গয়নার সিন্দুক থাকে সেই ঘরে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। যেন ইঁদুরেরা কুট্-কুট্ ক'রে কি কাটছে।

অন্ধকারে হঠাৎ আলো জ্ব'লে উঠল এবং চারজন ডিটেক্‌টিভ দৌড়ে গিয়ে দেখলে যে, লোহার সিন্দুকের সাম্‌নে একটি যুবক ব'সে আছে। রবিন্‌হুড্ পা দিয়েছে পুলিসের ফাঁদে।

হুগো কিন্তু পুলিসের চেয়ে ঢের বেশী চট্‌পটে।

এক মূহূর্ত্তে তার হাতের রিভলভার ঘন ঘন গর্জ্জন ক'রে উঠল এবং আলোগুলো গুলির চোটে ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে গেল।

আবার আলো জ্বেলে দেখা গেল, ঘরের মেঝের উপরে এক

ডিটেক্‌টিভ আহত ও আর একজন নিহত হ'য়ে রয়েছে এবং রবিন্‌হুড্ হয়েছে অদৃশ্য!

কিন্তু এত ক'রেও হুগো পালাতে পারলে না।

অন্ধকারে জানলা দিয়ে বেরিয়ে দড়ি বেয়ে সে পথে গিয়ে নামতে না নামতেই একদল পুলিসের লোক এসে তাকে

চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরলে!

মহাবলবান হুগো দানবের মত যুদ্ধ করতে লাগল, শত্রুর পর শত্রুকে বার বার কাবু ক'রে ফেললে, কিন্তু তবু রক্ষা পেলে না! পুলিসের দল বড়ই ভারি, হাতে হাতকড়া পরে এতদিন পরে তাকে কারাগারেই যেতে হ'ল!

পাঁচ

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বন্দী হুগো কারাকক্ষের রক্ষীকে ডেকে বললে, "ওহে আজ বোধহয় সমস্ত খবরের কাগজেই আমার কীর্ত্তির কথা বেরিয়েছে ?"

"—তা বেরিয়েছে বৈকি !"

"সেগুলো আমাকে পড়াতে পারো ? আমি দামও দেব, তোমাকে বখ্সিস্ও দেব।

রক্ষী এতে কোন দোষ দেখলে না। খানিক পরেই সে বস্তা বস্তা কাগজ কিনে এনে দিলে। ভিয়েনা সহর তো কলকাতার মত নয়, সেখানে লোক থাকে ঊনিশ লাখের কাছাকাছি, আর তাদের প্রায় সকলেরই রোজ খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস। কাজেই ভিয়েনায় প্রত্যহ খবরের কাগজ বেরোয় শত শত। এই সমস্ত কাগজের স্তূপ এত উঁচু হ'ল যে, হুগোর মূর্ত্তি তার মধ্যে প্রায় ঢাকা প'ড়ে গেল।

কয়েদখানার ঘরের বাইরে সমগ্র সশস্ত্র রক্ষী পায়চারি করছে এবং মিনিট-পনেরো অন্তর জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে হুগোকে দেখে যাচ্ছে। প্রতি বারেই দেখে, সে যেন গর্ব্বে স্ফীত হয়ে একমনে খবরের কাগজে নিজের কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করছে !

হুগো কিন্তু কাগজ পড়ছিল না। যেই রক্ষী চ'লে যায়, অমনি সে

দাঁড়িয়ে ওঠে। এবং অন্যদিকের একটা জান্‌লার কাছে গিয়ে খুব ছোট্ট একখানা উকো বার ক'রে গরাদের উপর ঘষ্‌তে থাকে। খুব পাৎলা অথচ শক্ত ইস্পাতের পাতে এই উকো তার নিজের হাতে তৈরি। পুলিস জামাকাপড হাৎড়ে তার সব জিনিস কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু এই উকো লুকানো ছিল তার জুতোর 'সোলে'র মধ্যে।

মাঝ-রাত্রে সে রক্ষীকে ডেকে বললে, "ওহে ভাই, আমার চোখ একে খারাপ, তায় এই কাম্‌রার আলোর জোর নেই। খবরের কাগজের এখানটা বড় ছোট ছোট হরপে ছাপা। জানালার কাছে এসে এ-জায়গাটা তুমি আমাকে প'ড়ে শোনাবে ?"

রক্ষী রাজি হয়ে সেই গরাদের কাছে এল, হুগো অম্‌নি নিজের-উকো-দিয়ে-কাটা গরাদের লোহার আঘাতে তাকে একেবারে অজ্ঞান ক'রে ফেললে। তারপর হাত বাড়িয়ে রক্ষীর পকেট থেকে দরজা খোলবার চাবি বার ক'রে নিলে।

... ...

শেষ-রাতে রক্ষী বদলাবার সময় এল। নূতন রক্ষী এসে পুরাণো রক্ষীকে দেখতে না পেয়ে উপরওয়ালাদের খবর দিলে।

কাম্‌রায় কাম্‌রায় খোঁজাখুঁজির পর হুগোর ঘরে পুরাণো রক্ষীর

মৃতদেহ পাওয়া গেল। কিন্তু হুগো কোথায়? তার কয়েদীর পোষাক রয়েছে রক্ষীর দেহে, কিন্তু রক্ষীর পোষাক কোথায়?

ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো খবরের কাগজ পাকানো অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। বন্দীর বিছানার গদী টুক্‌রো টুকরো ক'রে কাটা। এ-সবের অর্থ কি?

তারপর দেখা গেল, একটা জান্‌লার একটা গরাদে নেই। এবং আর-একটা গরাদে থেকে পাকানো খবরের কাগজের দড়ি ঝুল্‌ছে!

আশ্চর্য্য এই দড়ি! প্রথমে পাঁচ ছয়খানা খবরের কাগজ নিয়ে একসঙ্গে পাকানো হয়েছে। তারপর পাছে পাক্ খুলে যায়, সেই ভয়ে গদীর কাটা কাপড় জড়িয়ে তাকে শক্ত করা হয়েছে। তারপর একখানা পাকানো কাগজের সঙ্গে আর একখানা কাগজ বেঁধে ফেলা হয়েছে। তারপর সেই দড়ি ধ'রে হুগো নীচে নেমে চম্পট দিয়েছে!

আজও সেই অদ্ভুত দড়ি ভিয়েনা পুলিসের যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

হুগো

সেই সময়েই অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর সঙ্গে প্রায় সারা-য়ুরোপের মহাযুদ্ধ বাধল। এবং সেই আধুনিক কুরুক্ষেত্রের পৃথিবীব্যাপী কোলাহলে হুগোর কথা চাপা প'ড়ে গেল।

চার বৎসর পরে যখন মৃত্যুস্রোত বন্ধ হ'ল, অষ্ট্রিয়ার আকার ও শক্তি তখন নগণ্য। এই জাতীয় অধঃপতনের সময়ে হুগোর কথা নিয়ে পুলিসও মাথা ঘামাতে পারে নি।

যে মাংস-ব্যবসায়ীকে অবলম্বন ক'রে পুলিস হুগোকে ধ'রেছিল, সে এখন সত্যসত্যই অগাধ টাকার মালিক। বড় বড় আমীর-ওমরাদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রায়ই সে ভোজ দেয়।

একদিন এক বড় হোটেলে কাউণ্ট রিচার্ড নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হ'ল এবং সেই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হ'তে দেরি লাগল না।

কাউণ্ট একদিন বললেন, "বন্ধু, এ-রকম ছোট ছোট ভোজ দিয়ে কোন লাভ নেই। এমন এক ভোজ আর বল-নাচ দাও, যা সারা-রাত ধ'রে চলবে। দেশের সমস্ত ধনী মেয়ে-পুরুষকে নিমন্ত্রণ কর। তাহ'লে তোমার খ্যাতির আর সীমা থাকবে না।"

মাংসবিক্রেতা ধনী হয়ে আজ সম্ভ্রান্ত-সমাজে নাম কিনতে চায়। সে তখনি রাজি হয়ে গেল এবং এই বিরাট আয়োজনের ভার দিলে কাউণ্ট রিচার্ডেরই হাতে।

ভোজের রাত্রে ভিয়েনার সমস্ত সম্ভ্রান্ত নর-নারী মাংস-বিক্রেতার বাড়ীতে এসে হাজির। চারিদিকে মণি-মুক্তায় বিদ্যুৎ জ্বলছে।

কাউণ্ট তার বন্ধুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ওহে, এ-সব ব্যাপারে নাচের সময়ে প্রায়ই দামী গয়নাগাঁটি চুরি যায়। তোমার অতিথিদের বল, বেশী-দামী গয়নাগুলো আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্যে তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দিতে। নাচ শেষ হ'লে আবার সেগুলো ফিরিয়ে দিও।"

সেই কথামতই কাজ হ'ল!

শেষ-রাতে বল-নাচ হয়ে গেলে পর অতিথিরা গয়না ফেরৎ চাইলেন।

কিন্তু লোহার সিন্দুক খুলে দেখা গেল, প্রায় চারলক্ষ টাকার গহনার একখানাও নেই। কাউণ্ট রিচার্ডেরও খোঁজ পাওয়া গেল না!

দেশময় হৈ-চৈ! এমন চুরির কথা কেউ কখনো শোনে নি! সবাই অবাক্! পুলিসও হতভম্ব!

কোন কোন খবরের কাগজ তখন মনে করিয়ে দিলে যে, এই মাংসব্যবসায়ীর বাড়ীতেই রবিন্‌হুড্ ধরা পড়েছিল! আজ চার বছর পরে রবিন্‌হুড্ প্রতিশোধ নিয়েছে।

কথাটা পুলিসের মনে লাগল। চারিদিকে দলে দলে ডিটেক্‌টিভ্ ছুটল, কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে রবিন্‌হুডের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সাত

দুই বৎসর পরে গুপ্তচরের মুখে খবর পাওয়া গেল, ভিয়েনা থেকে বিশ মাইল দূরে, ছোট্ট এক সহরে এক যুবক একাকী বাস করে।

সে ধনী, কিন্তু কারুর সঙ্গে মেশে না। বাড়ীতে ব'সে লেখাপড়া করে, ও মাঝে মাঝে বাইসাইকেলে চ'ড়ে বেড়াতে যায়।

পুলিস ভাবতে লাগল,—কে সে? কেন সে একলা থাকে? কেমন ক'রে তার সংসার চলে? একবার তো তাকে দেখা দরকার!

হুগোকে চেনে এমন লোকের সঙ্গে একদল সশস্ত্র পুলিস পাঠানো হ'ল।

দূর থেকে দেখা গেল, একজন লোক বাইসাইকেল চ'ড়ে আসছে!

হ্যাঁ! ঐ তো হুগো রবিন্‌হুড্!

পুলিস বন্দুক তুললে, হুগোও রিভলভার বার করলে!

কিন্তু হুগো ধরা পড়ল না, পুলিসের গুলিতে মরণের মুখে আত্ম-সমর্পণ করলে!

* * * *

* * *

বিচিত্র এই আধুনিক রবিন্‌হুডের জীবন! হুগো ধনীর টাকা চুরি ক'রে গরীবকে দান করত। কিন্তু অসৎ পথে গিয়ে সৎকাজ করার যে কোন মূল্যই নেই, হুগোর অকালমৃত্যু সেইটেই প্রমাণিত করছে!

হুগোর যে বুদ্ধি, যে প্রতিভা ও যে সাহস ছিল, ভালো পথে থাকলে নিশ্চয়ই সে আজ দেশবিদেশে প্রাতঃস্মরণীয় অমর ব্যক্তি হ'তে পারত।

ভালো কাজ যদি করতে চাও, ভালো পথে থাকতে হবে।

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ-গল্প শুনতে ভালোবাস। কেবল তোমরা কেন, পৃথিবীর সব দেশেই এ-শ্রেণীর গল্পের আদর আছে। অনেক লেখক কেবল ডিটেকটিভ-কাহিনী লিখেই অমর হয়েছেন। বাংলাদেশের পুরাণো গল্পে ও রূপকথাতেও গোয়েন্দা-কাহিনীর অল্পবিস্তর বিশেষত্ব পাওয়া যায়।

আধুনিক ভালো গোয়েন্দার গল্প বলতে কতকগুলো চমকদার ঘটনার সমষ্টি বোঝায় না; কারণ প্রধানত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বুদ্ধির খেলা দেখানো। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক গোয়েন্দাকাহিনীর স্রষ্টা ব'লে আমেরিকান লেখক এড্‌গার অ্যালেন পো'র নাম করা হয়। তিনি মাত্র গুটি তিনেক ছোট ছোট গোয়েন্দার গল্প লিখে গেছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পই অপূর্ব্ব! সেগুলি কাল্পনিক

গল্প হ'লেও সত্যিকার গোয়েন্দারাও যে তা প'ড়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে, এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

একবার আমেরিকায় একটি মেয়ে খুন হয়। তাই নিয়ে চারিদিকে মহা সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও পুলিস খুনীকে ধরতে পারলে না। তখন পো সাহেব সেই খুন অবলম্বন ক'রে একটি ছোট গল্প লিখলেন। প্রথমটা সকলেই গল্প হিসাবেই তাকে গ্রহণ করলে। কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যিকার খুনের সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তি যে-সব কথা প্রকাশ ক'রে দিলে তাতে জানা গেল যে, পো-সাহেবের সৃষ্ট কাল্পনিক ডিটেকটিভের সন্দেহ ও অনুমানই সত্য!

ইংরেজ লেখক স্যর আর্থার কন্যান্ ডইলের নাম আজ কে না জানে? তাঁর লেখা সার্লক্ হোম্‌সের গল্প পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এড্‌গার অ্যালেন পো যদি গোয়েন্দার গল্প না লিখতেন, তাহ'লে সার্লক হোম্‌সের নাম আজ কেউ শুনতে পেত কিনা সন্দেহ!

তবে আসলে আধুনিক গোয়েন্দা-কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে আঠারো শতাব্দীতে ফরাসী দেশে। তোমরা এখনও ভল্‌তারের বই পড়নি বোধ হয়? রুসো নামে আর এক ফরাসী লেখকের সঙ্গে ভল্‌তারের রচনা ফরাসী-বিপ্লবের মূলে কাজ করেছিল যথেষ্ট। এই ভল্‌তারের একখানি উপন্যাস আছে, তার নাম "জ্যাড্‌উইগ।" সেই উপন্যাসে দেখা যায়, রাণীর কুকুর ও রাজার ঘোড়া হারিয়ে গেল, কিন্তু জ্যাড্‌উইগ পথের উপরে কেবল তাদের পদচিহ্ন দেখে ব'লে দিলে, কুকুরটা মদ্দা না মাদী, সেটা কোন্ জাতের, তার বাচ্ছা হয়েছে কিনা

ও তার ল্যাজ কত বড় এবং ঘোড়ার আকার কত উঁচু, তার পা খোঁড়া কিনা প্রভৃতি আরো অনেক আশ্চর্য্য কথা।

এই জ্যাড্‌উইগের বুদ্ধি-কৌশলে রাজা কেমন ক'রে সাধু কোষাধ্যক্ষ পেয়েছিলেন, সে গল্পটাও শোনবার মত।

একদিন রাজা দুঃখ করে বললেন, "জ্যাড্‌উইগ, আজ পর্য্যন্ত আমি কোন সাধু কোষাধ্যক্ষ পেলুম না। যাকে কোষাধ্যক্ষের পদ দিই, সেই-ই হাতে টাকা চুরি করে। তুমি তো এত বুদ্ধিমান, সাধু কোষাধ্যক্ষ পাওয়া যায় কেমন ক'রে, বলতে পারো?"

জ্যাড্‌উইগ বললে, "পারি মহারাজ। যে সব-চেয়ে ভাল নাচতে পারবে, সেই ই সাধু কোষাধ্যক্ষ।"

রাজা বললেন, "পাগলের মত কি যে বল, ঠিক নেই! ভালো নাচিয়ে হ'লেই সাধু হবে? যা নয় তাই!"

জাড্‌উইগ বললে, "আমার কথা সত্য কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। আমি যা যা বলি তার ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

—"কি ব্যবস্থা?"

—"রাজসভার পাশের একখানা ঘরে রাশি রাশি হীরে-চুণী-পান্না রেখে দিন। তারপর যারা আপনার কোষাধ্যক্ষ হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে, তাদের একে একে সেই ঘরে ঢুকে সভায় আসতে বলুন। ঘরের বাইরে সেপাই পাহারা দিক্, কিন্তু ভিতরে যেন কেউ না থাকে।"

রাজা তখনি জ্যাড্‌উইগের কথা মত সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যারা কোষাধ্যক্ষের পদ চায় তারা প্রত্যেকেই সেই রত্নগৃহের ভিতর দিয়ে একে একে রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বললেন, "তোমরা কোষাধ্যক্ষ হ'তে চাও? বেশ, তাহ'লে নাচ আরম্ভ কর।"

—"সে কি মহারাজ। নাচতে হবে?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে নাচবে না তার আবেদনও গ্রাহ্য হবে না। ধর নাচ!"

রাজার সিংহাসনের পিছনে দাঁড়িয়ে জ্যাড্উইগ দেখলে, কোষাধ্যক্ষ-পদপ্রার্থীরা হতাশ মুখে নৃত্য সুরু করলে। কিন্তু তারা ভালো ক'রে নাচতেই পারলে না—তাদের দেহ জড়ো-সড়ো ও আড়ষ্ট, মাথা হেঁট, দুই হাত শরীরের দুই দিকে সংলগ্ন, কারুর নাচেই স্বাধীন গতি নেই। ধুপ ধুপ ক'রে মাটিতে পা ছুঁড়ে ধেই-ধেই ক'রে নেচে তারা কেবল নাচের নামরক্ষা করছে মাত্র।

জ্যাড্উইগ ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "পাজী, ছুঁচো, বদ্মাইসের দল!"

কিন্তু একটি লোক চমৎকার নাচছে! তার দেহে সঙ্কোচের কোন লক্ষণই নেই, মাথা উন্নত, হাত-পায়ের লীলা মনোরম।

জ্যাড্উইগ বললে, "মহারাজ, এই লোকটি সাধু। একেই আপনার কোষাধ্যক্ষের পদ দিন!"

রাজা বিস্মিত স্বরে বললেন, "কি ক'রে তুমি জানলে যে, এই লোকটি সাধু?"

জ্যাড্উইগ বললে, "মহারাজ, এই একশোজন লোক আপনার কোষাধ্যক্ষ হ'তে এসেছে। কিন্তু ঐ একজন ছাড়া বাকি সবাই যখন

একে একে রত্নগৃহের ভিতর দিয়ে এসেছে, তখন লোভ সামলাতে না পেরে মুঠো মুঠো হীরে-চুণী-পান্না তুলে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলেছে। কাজেই পাছে সেগুলো পকেট থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে ওরা ভালো ক'রে নাচতেই পারছে না।"

রাজা দুঃখিতভাবে বললেন, "একশো জনের মধ্যে মোটে একজন সাধু!"

জ্যাড্‌উইগ বললে, "মহারাজ, একজন সাধু একাই একশো।"

বলা বাহুল্য, সেই সাধু ব্যক্তিই কোষাধ্যক্ষের কাজ পেলে। বাকি লোকগুলোর কাছ থেকে চোরাই মাল কেড়ে নেওয়া হ'ল তো বটেই, তার উপরে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হ'ল।

কিন্তু আঠারো শতাব্দীর য়ুরোপের কথা তো অতি-আধুনিক কথা! ডিটেক্‌টিভ গল্পের সৃষ্টি হয়েছে আরো বহু শতাব্দী আগে। পৃথিবীতে যখন ঐতিহাসিক যুগ সবে আরম্ভ হয়েছে, তখনকারও একটি ডিটেকটিভ গল্প আমরা পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আগে পৃথিবীতে আর কোন গোয়েন্দা-কাহিনী লেখা হয় নি।

এই গল্পের নায়ক বা ডিটেকটিভ হচ্ছেন দানিয়েল, বাইবেলে যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি ব'লে বিখ্যাত। ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে বাবিলন।

প্রাচীন বাবিলনে এক মস্ত দেবতা ছিলেন তাঁর নাম বেল্। তাঁকে 'মহা-পর্ব্বত' ব'লেও ডাকা হ'ত।

হিন্দুদের দেব-দেবীরা এক হিসাবে রীতিমত নির্লোভ। তাঁদের সামনে যত ভালো খাবারই ভোগ ব'লে ধরে দাও, তাঁরা নির্নিমেষ নেত্রে কেবল সেইদিকে তাকিয়ে থেকেই খুসি হন, পরে খাবারগুলো

অদৃশ্য হয় প্রকাশ্য ভাবেই ভক্তদের ক্ষুধার্ত্ত উদর-গহ্বরে। কে জানে মা-কালীর যদি মাংস খাবার শক্তি থাকত, তাহ'লে কালীঘাটে এত-বেশী পাঁঠা বলি দেওয়া হ'ত কিনা।

কিন্তু বাবিলনের বেল্ ছিলেন দস্তুরমত পেটুক দেবতা। তাঁর সামনে ভোগ দিলে ভক্তদের একটি কণাও প্রসাদ পাবার উপায় ছিল না। অন্ততঃ বাবিলনবাসীরা সেই কথাই মনে করত।

প্রকাণ্ড দেবালয়, তার চূড়ো যেন আকাশ ভেদ করতে চায়। দেবালয়ের সঙ্গেই সংলগ্ন এক প্রাসাদে ঠাকুরের পুরোহিতরা বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করে।

ভোগমন্দিরে রাজবাড়ী থেকে রোজ বড় বড় থালায় রাশি রাশি উপাদেয় খাবার আসে, ঠাকুরের পেট ভরবার জন্যে।

বেল্-ঠাকুর খাইয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু লোকের চোখের সামনে খেতে হয়তো তাঁর লজ্জা হয়। তাই তাঁর সামনে খাবারের থালা-গুলো সাজিয়ে রেখে সবাই সরে পড়ে এবং রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু রোজ সকালে উঠে দেখা যায়—কি আশ্চর্য্য! পাথরের ঠাকুর বেল্ জ্যান্তো হয়ে সব খাবার খেয়ে হজম ক'রে ফেলেছেন!

দেবতার শক্তি দেখে রাজার মনে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর ধরে না। এবং যাদের মন্ত্রশক্তিতে দেবতা এমন জাগ্রত, সেই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও লাভের অঙ্ক বেড়ে উঠল রীতিমত।

এমন সময়ে ঘটনাক্ষেত্রে দানিয়েলের প্রবেশ। জাতে তিনি

ছিলেন ইহুদী, বাবিলনে এসেছেন যুদ্ধে বন্দী হয়ে। কাজেই বেলের উপরে তাঁর একটুও ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই।

দানিয়েল সমস্ত দেখে শুনে একদিন বললেন "মহারাজ, পাথুরে দেবতার পেটের ভিতরটাও নিরেট পাথরে ভর্ত্তি হয়ে আছে, রাশি রাশি মিস্টান্ন, ফল আর মাংসের লোভে সে পেট ফাঁপা হ'তে পারে না। বেল্ এ-সব খাবার খান না।"

রাজা বললেন, "কি যে বল তার মানে হয় না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে জনপ্রাণী থাকে না, তবু খাবার কোথায় উড়ে যায়?"

দানিয়েল বললেন, "আমার মুখে সে কথা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতে দিন, তারপর কাল সকালেই আপনাকে দেখাব, বেল খাবার খান না।"

সে-রাতেও ষোড়শোপচারে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হ'ল।

তারপর দানিয়েল এসে প্রথমে মন্দিরের মেঝের উপরে সর্বত্র ভালো ক'রে ছাই ছড়িয়ে দিলেন এবং তারপর মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেলেন।

সকাল হ'ল। রাজাকে সঙ্গে ক'রে দানিয়েল মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজা খোলা হ'ল। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ঠাকুর চেটেপুটে সব থালার খাবার খেয়ে ফেলেছেন।

রাজার পুরোহিতরা ও সাঙ্গোপাঙ্গোরা দানিয়েলকে লক্ষ্য ক'রে বললে, "কোথাকার এক অবিশ্বাসী ইহুদী এসে আমাদের এত-বড় ঠাকুরের শক্তিতে সন্দেহ করে। কী স্পর্দ্ধা।"

রাজা দেবমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে গদগদ স্বরে বললেন, "হে বাবিলনের সনাতন দেবতা, হে মহাপ্রভু বেল্! অসীম তোমার মহিমা, জাগ্রত তোমার উদর!"

দানিয়েল কিন্তু কিছুমাত্র দমলেন না। হাসিমুখে বললেন, "মহারাজ, মন্দিরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

ছাই-ছড়ানো মেঝের দিকে তাকিয়ে রাজা সবিস্ময়ে বললেন, "একি! এখানে এত ছাই কেন? ছাইয়ের উপরে এত পায়ের দাগ এল কেমন ক'রে? এ যে দেখছি পুরুষের পায়ের দাগ, মেয়ের পায়ের দাগ, শিশুর পায়ের দাগ! এ-সবের মানে কি?"

দানিয়েল বললেন, "মানে খুব স্পষ্ট, মহারাজ! মন্দিরের পিছনে এক গুপ্তদ্বার আছে। পুরুতরা তাদের বউ আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেবতার ভোগ পেট ভ'রে খেয়ে পালায়। কিন্তু কাল যে আমি এখানে ছাই ছড়িয়ে রেখেছি, অন্ধকারে সেটা তারা দেখতে পায় নি। তাই পায়ের দাগই তাদের ধরিয়ে দিলে।"

তখন রাজার চোখ ফুটল। বেলের উপরে তাঁর ভক্তি কমল কিনা জানি না, কিন্তু পুরোহিতদের প্রাণদণ্ড হ'ল।

-শেষ-